শ্রীশ্রীগোপালসেবা-কাহিনী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কর

প্রকাশক : শ্রীউপেন্দ্রনাথ কর গ্রন্থকার
পোঃ উদয়রাজপুর, ২৪ পরগণা

প্রাপ্তিস্থান :

১। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি এণ্ড কোং,
১৫, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

২। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী,
চৌধুরীভবন, রানীপার্ক,
পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা

৩। শ্রীবিজয়চন্দ্র ঘোষ,
নবপল্লী, পোঃ বারাসাত, ২৪ পরগণা

৪। শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, মোক্তার,
পোঃ উদয়রাজপুর, ২৪ পরগণা

৫। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
নায়েব, শ্রীশ্রীগোপালবাড়ী,
পোঃ রাংদিয়া, খুলনা

৬। শ্রীনারায়ণচন্দ্র নাথ,
নরেন্দ্রনারায়ণ বস্ত্রালয়,
পোঃ বাগেরহাট, খুলনা

৭। শ্রীপ্রফুল্লকুমার নাথ,
শ্রীহোসিয়ারী, নাগেরবাজার,
পোঃ বাগেরহাট, খুলনা

মুদ্রাকর :

শ্রীঘনশ্যাম নাথ
অশোক প্রিন্টার্স
৮৮ডি বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

শ্রীশ্রীগোপালসেবার ভিক্ষা : দুই টাকা

নিবেদন

শ্রীপাট লাউপালার সিদ্ধ মহাত্মা বালকদাসবাবাজী-সেবিত শ্রীশ্রীগোপালজীউর সেবাকার্যে শ্রীশ্রীগোপালমন্দির-কমিটীর সম্পাদকরূপে আমি গোপালবাড়ীর সহিত বহু বৎসর যাবৎ সংশ্লিষ্ট ছিলাম। ভারতবর্ষে বৃটিশশাসন অবসান হওয়ার পর আমি খুলনা জিলাবোর্ডের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৯৪৭ সাল হইতে ভুবনেশ্বরে বসবাস করিতেছিলাম। আমার প্রবাসকালে গোপালবাড়ীর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য মন্দির-কমিটীর সম্পাদকের কর্তব্যভার বাগেরহাটের উকীল শরৎচন্দ্র নাথ, বি.এল. মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। শরৎবাবু কয়েক বৎসর গোপালবাড়ীর সকল বিষয় দেখাশুনা করিবার সময় গোপালবাড়ী সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা ও অবস্থার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন তাহা সব লিপিবদ্ধ করিয়া মুদ্রণ ও প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল বাসনা জাগে। তজ্জন্য তিনি আমার-জানা যাবতীয় বিষয় লিখিয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। শ্রীশ্রীগোপালসেবা সম্বন্ধে কোন কাহিনী লিখিবার ইচ্ছা আমার মনে কোনদিন জাগরিত হয় নাই; কিন্তু বন্ধুবর শরৎবাবুর ঐকান্তিকতায় ও প্রেরণায় মন্দির-কমিটীর সেবা-প্রচেষ্টার ইতিহাস শ্রীশ্রীগোপালের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

গ্রন্থে নানাবিষয়ের প্রসঙ্গে অনেক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে হইয়াছে। কোন লেখায় যদি কাহারো মনোকষ্টের কারণ হয় তজ্জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। মনে কষ্ট দিবার জন্য নহে, সত্যের অনুরোধেই সব লিখিত হইয়াছে।

বহুদিন পর্যন্ত মন্দির-কমিটীর সেবা-প্রচেষ্টার সময় আমরা বহু লোকের নিকট হইতে নানাপ্রকার সহযোগিতা ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি,—তাঁহাদের অনেকের কথাই এই গ্রন্থে উল্লেখ করার সুযোগ হয় নাই; তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

অনেক সরকারী উচ্চকর্মচারী ও বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীশ্রীগোপাল-বাড়ী ও তাঁহার নানাবিধ সেবা-প্রচেষ্টা দর্শন করিয়া যে সকল মন্তব্য লিপি-

বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার কয়েকটী পরিশিষ্টে প্রকাশ করা গেল। সেবা সম্বন্ধীয় কার্যাদির জন্য মন্দির-কমিটীর কার্য পরিচালনের নিমিত্ত কয়েকটী সভার অধিবেশনে কতিপয় নিয়ম প্রণীত হইয়াছিল। উক্ত নিয়মাবলী যে মন্তব্য বহিতে (Minute Book) লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা উইলের মোকদ্দমায় দাখিল হইলে পরে হাইকোর্টের পেপার-বুকে মুদ্রিত হইয়াছিল। পেপার-বুক হইতে ঐ সকল সভার বিবরণাদিও প্রকাশ করা হইল।

গ্রন্থ লিখিত হইবার পর যোগেন্দ্রনাথ বসু, বি.এ. মহাশয় তাহা স্পষ্টাক্ষরে নকল করিয়া দেওয়ায় তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। শরৎচন্দ্র নাথ মহাশয় গ্রন্থ সংশোধন, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ এবং প্রুফসংশোধন প্রভৃতি কার্য দ্বারা গ্রন্থপ্রকাশ করিতে প্রভূত সহায়তা করিয়া আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

উঁহাদের উপর শ্রীশ্রীগোপালজীউর কৃপাধারা বর্ষিত হউক—ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি।

আমি নিতান্ত অজ্ঞ ও সাধনভজনহীন। শ্রীশ্রীগোপালের সেবার বিষয় কিছু লিখি, সেরূপ যোগ্যতা আমার নাই। তাঁহার করুণায় যাহা স্ফুরিত হইয়াছে তাহাই প্রকাশ করা হইল। আমার ত্রুটীবিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ অনুগ্রহ পূর্বক আমার ত্রুটীবিচ্যুতি প্রদর্শন করিয়া তাহা সংশোধনের সুযোগ দিবেন—ইহাই তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা।

বৈশাখী পূর্ণিমা—
সন ১৩৪৪ সাল।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীউপেন্দ্রনাথ কর

উদয়রাজপুর, ২৪ পরগণা

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
দর্শণাকাঙ্ক্ষী	দর্শনাকাঙ্ক্ষী	৪	১০
কাছাস্বীয়	কাছারীর	২৪	১৭
ধর্মেয়	ধর্মের	৩৮	১৮
কামটী	কমিটী	৪০	৪
আপনি	আমি	৫৫	২২
সাহিত্য	মাহিষ্য	৬৬	৭
১	১/৩	৯৮	২২
১	১/৩	৯৮	২৭
নিদিষ্ট	নির্দিষ্ট	৯৯	২৪
ষ্যায়	ন্যায়	১০৪	১৬

বালকদাস বাবাজী-সেবিত
শ্রীশ্রীগোপালজীউ

শ্রীশ্রীগোপালের প্রতিনিধি বিগ্রহ

শ্রীমদ্ বালকদাস বাবাজীর
সমাধি

শ্রীশ্রীগোপাল মন্দিরের অতিথিশালা
ও তদুপরিস্থ দোলমঞ্চ
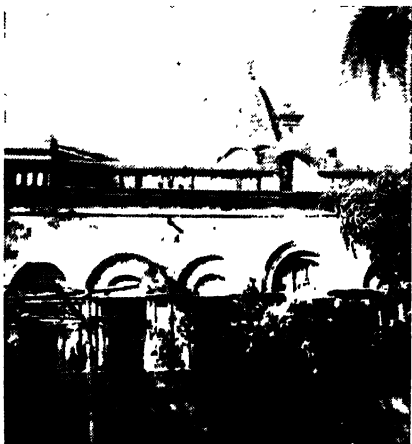
শ্রীশ্রীগোপালজীউর রথ

শ্রীশ্রীগোপাল মন্দিরের
প্রাথমিক বিদ্যালয়

শ্রীশ্রীগোপালসেবা-কাহিনী

শ্রীপাট লাউপালার অবস্থিতি

খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায়, বাগেরহাট হইতে পাঁচ মাইল দূরে ভৈরব নদের তীরে লাউপালা নামক গ্রাম্য-তীর্থ অবস্থিত। স্থানটী শান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর। সাধন-ভজনের অনুকূল দেখিয়া প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে সিদ্ধমহাত্মা শ্রীমদ্‌ বালকদাস বাবাজী এই স্থানে তদীয় শ্রীগুরুদেব নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ত্যক্তবৈষ্ণব শ্রীমন্নকুল ব্রহ্মচারী মহোদয়প্রদত্ত শ্রীশ্রীগোপালজীউর কাঞ্চনময় বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি শ্রীশ্রীগোপালের অপার করুণায় এতদ্দেশবাসী বহু লোকের জীবন ধন্য হইয়াছে। ত্যক্তবৈষ্ণবভক্ত বালকদাস বাবাজী মহারাজ লাউপালা গ্রামে শ্রীশ্রীগোপালজীউর মন্দির, নাটমন্দির, ভোগশালা ও বৈষ্ণবখণ্ড প্রভৃতি স্থাপন করেন।

এ-সম্বন্ধে Statistical Accounts of Bengal by W. W. Hunter, B.A., L.L.D., Hunter's History of Jessore and Nadia (1875) এবং Bengal District Gazatteer of Khulna by L.S.S.O. Molley, L.C.S., Chapter XV-এ যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"Statistical Accounts of Bengal, Page 231.

"The village of Jatrapur is chiefly notable for a great temple of the Vaishnava sect. The idol "Gopal" who dwells in the temple is an ancient resident of the village, but this temple was erected

only two generations ago by a Vaishnava named Ballaka Das alias Babaji, who is buried here."

Bengal District Gazetteer, Chap. XV :—

"Jatrapur—A village and market in the Bagerhat subdivision situated midway between Fakirhat and Bagerhat. The village is of considerable size and has an extensive trade in batel-nuts and cocoanuts. It is chiefly notable for a large temple of the Vaishnava sect, dedicated to "Gopal" which was erected about three generations ago, by a Vaishnava Babaji named Ballaka Das. The wealth which he employed to raise and endow the temple was acquired by begging, but his followers attribute to him miraculous powers, because after coming to the country a penniless beggar he managed to build a fine temple of Gopal. Thereafter a new temple has been added, dedicated to the Babaji which was built by his followers upon the spot where he was buried. The temples are frequently visited by pilgrims who make journeys of even three to four days in order to visit them."

এই সময় লাউপালা ও যাত্রাপুরের মধ্যে খাল কাটা হয় নাই, সুতরাং উভয় গ্রাম একই পারে অবস্থিত ছিল এবং যাত্রাপুরে জমিদারের কাছারী ও হাট ইত্যাদি থাকায় ঐতিহাসিকেরা লাউপালাকে যাত্রাপুর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে বৃদ্ধ বৈষ্ণব ও মান্‌সা কাছারীর ম্যানেজার ও বাহিরদীয়া ইউনিয়ন কমিটীর চেয়ারম্যান স্বর্গত ভগীরথ সেন মহাশয়ের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য। (Vide Report of Bhagirath Sen, Manager, Mansa Katchery, Chairman, Bahirdia Union Committee in connection with Criminal

Case No. 869 of 1925, Bagerhat Court : Ramlal Adhikari *Vs.* Upendranath Kar and others.)

আমার প্রথম শ্রীশ্রীগোপালদর্শন

বাংলা অনুমান ১৩০৯ সাল, ইং ১৯০২। আমার বয়স ১৩ বৎসর হইবে। এই সময় একবার রথযাত্রার মেলায় গিয়া আমি শ্রীশ্রীগোপাল দর্শন করি। তখন মান্‌সার নদী দিয়া ষ্টীমার চলিত। আমি আমার আত্মীয় মৌভোগনিবাসী আশুতোষ মিত্রের সহিত গোপালের রথের মেলা ও গোপাল দর্শন করিতে যাই। তখনকার মেলার প্রচুর কাদা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় আমার বিশেষ স্মরণ নাই।

দ্বিতীয়বার শ্রীশ্রীগোপালদর্শন

আমার এই সৌভাগ্য ঘটে ইং ১৯১৩ সালে। তখন আমি খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে সার্ভেয়ার পদে নিযুক্ত ছিলাম। কার্যব্যপদেশে কাইটপাড়া ও কাতিকদীয়া প্রভৃতি গ্রামে আমার যাওয়ার সুযোগ ঘটে। কাইটপাড়ানিবাসী মথুরানাথ ঘোষ মহাশয়ের মধ্যমপুত্র অসিতকুমার (কালাঘোষ) ছিলেন বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন—সম্পর্কে আমার ভাগিনা ও বন্ধু। তাঁহারই সঙ্গে আমি দ্বিতীয়বার শ্রীশ্রীগোপাল দর্শন লাভ করি। পার্শ্ববর্তী কাতিকদীয়া গ্রামে পরমভাগবত গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাস ছিল। ভক্তবৈষ্ণব ও কীর্তনীয়া রূপে তাঁহার সমধিক খ্যাতি ছিল। শ্রীমান্ কালার নিকট তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শনের জন্য আমার আগ্রহ হইল। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই তাঁহার সহিত আমার এমন সৌহার্দ্য জন্মিল যে, আমার জীবনে তদ্রূপ অতি অল্প লোকের সহিত ঘটিয়াছে। ঐ গ্রামে আরো তিনজন প্রাচীন ভজনানন্দী বৈষ্ণবের দর্শন পাইয়াছিলাম—রসিকলাল নাথ কবিরাজ, মদনচন্দ্র নাথ ও অদ্বৈত-

চন্দ্র বিশ্বাস। উঁহারাই শ্রীশ্রীগোপাল বাড়ীর দ্রষ্টব্য যাবতীয় বিষয় আমাকে দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগোপাল-বাড়ীর তৎকালীন অবস্থা

শ্রীশ্রীগোপাল-বাড়ীর মূল মন্দির, নাটমন্দির, বৈষ্ণবখণ্ড প্রভৃতি ইমারতগুলির ও সেবাদির যে অবস্থা দেখিলাম, তাহাতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইলাম। মূলমন্দিরের ছাদ দিয়া জল পড়ে, বৈষ্ণবখণ্ডের কামরাগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে ও তাহার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে; নাটমন্দিরের ছাদের কড়িবরগাগুলি জল লাগিয়া পচিয়া গিয়াছে, কতকগুলি ভূমিসাৎও হইয়াছে,—এমন কি যে কোন মুহূর্তে দর্শণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ চাপা পড়িতে পারেন। সমাধি-মন্দিরগুলি ধ্বংসোন্মুখ—প্রায়গুলিরই ছাদ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। যেটির ছাদ পড়ে নাই, সেটির ছাদ দিয়াও বাবাজী মহারাজের সমাধির উপর জল পড়ে এবং সেই ছাদে ও দেওয়ালে বট ও নানাজাতীয় গাছের জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে। ভোগমন্দির ধ্বংস হইয়াছে, গোলপাতার জীর্ণ-কুটীরে ভোগ পাক হয়। মোহান্তের বাসের জন্য একখানি জীর্ণকুটীর,—তাহার এক বারান্দায় মোহান্ত শয়ন করেন, ঘরের মধ্যে ভাণ্ডার থাকে। বহিরাগত কেহ আসিয়া রাত্রিযাপন করিতে পারেন, এমন স্থান শ্রীশ্রীগোপাল-বাড়ীতে তখন ছিল না। শ্রীশ্রীগোপালের পুকুরের ঘাট ধ্বসিয়া পড়িয়াছে; জলপূর্ণ কলসী নিয়া নারীদের সেই ঘাট দিয়া উঠা-নামা অতিশয় বিপজ্জনক। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগের বাগান তদ্বিরের অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ। শুনিলাম—শীতকালে ঐ বাগানে বাঘও বাস করিয়া থাকে। এই প্রকার যে দিকেই তাকান যায় সেই দিকেই বুঝা যায়—বহুদিন যাবৎ দৃষ্টির অভাবে চারিদিকেই একটা ধ্বংসলীলার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। সেবাদি সম্বন্ধে খোঁজ লইয়া জানিলাম—

তাহারও চরম দুরবস্থা। শ্রীশ্রীগোপালের রথের মেলার ও অন্যান্য প্রকারের আয় জমিদারকর্মচারীদেরই হস্তগত হয়। শ্রীশ্রীগোপালের নিত্য সেবার কোন নিশ্চিত ব্যবস্থাই নাই। পূজারী ঠাকুর জমিদারের কাছারীবাড়ীতে ধর্ণা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া সামান্য কিছু চাউল প্রাপ্ত হন, তাহা দ্বারা নামমাত্র অন্নভোগ চলে। ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বন্ধুবর কালাঘোষ এইভাবে তৎকালীন গোপলবাড়ীর অবস্থার বিষয় আমাকে অবগত করাইলেন। তখন, কি জানি কেন, আমার অন্তরে একটা প্রেরণা ও ইচ্ছা জাগিতে লাগিল যে, যদি এই ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরের সেবার ভার কোনও রকমে শ্রীশ্রীগোপাল আমাদের উপর ন্যস্ত করিতেন, তবে একবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া দেখিতাম,—গোপালের সেবা ও মন্দিরাদি মেরামতের কোন আনুকূল্য করা যায় কিনা। চিন্তাটি মনে উদিত হইয়া মনেই বিলীন হইল। তখন সরকারীকার্যব্যপদেশে যে বাগেরহাটে আসিতে পারিব তাহা কল্পনাতীত ছিল। এবারে এই পর্যন্তই দর্শনাদি করিয়া খুলনায় ফিরিলাম।

সরকারীকার্যে আমার বাগেরহাটে আগমন

শ্রীশ্রীগোপালের কৃপায় ১৯১৫ সালে মাত্র দেড় মাসের জন্য অস্থায়ী সাব্-ওভারসিয়ার-পদে বাগেরহাটে আসিলাম। আমার বেশ স্মরণ আছে, আমি খুলনা হইতে বাগেরহাটে আসিবার সময় তৎকালীন ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার রসিকলাল দুই মহাশয়কে বলিয়াছিলাম যে, আমার মাতৃহীন ছোট ভাইবোন ও বৃদ্ধ পিতার সেবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে, তজ্জন্য এই দেড়মাসের বেশী এক দিনও যেন আমাকে বাগেরহাটে না রাখেন। একটি কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি—আমি পূর্বে P.W.D.-তে কাজ করিতাম। পাঁচ বৎসর সেখানে কাজ করার পর আমাকে খুলনা হইতে মেদিনীপুরে বদলী করা হয়। তাহারই কয়েক বৎসর পূর্বে আমার

মাতৃবিয়োগ হওয়ায় কয়েকটী নাবালক ভাইবোনের ও বৃদ্ধ পিতার দেখাশুনার ভার আমার উপর পতিত হয়। তজ্জন্য বাড়ীতে থাকার আশায় আমি P.W.D.-র কর্ম ত্যাগ করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ম গ্রহণ করি। তখনকার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার আমাকে সেইরূপ ভরসাও দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"বাগেরহাটের ওভারসিয়ার অমৃতলাল মিত্রের পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার শ্রাদ্ধাদির জন্য তিনি দেড় মাসের ছুটি চাহিয়াছেন, কাজেই ওই দেড় মাস আপনাকে বাগেরহাটে থাকিতে হইবে।" অমৃতবাবুর পিতার সহিত আমাদের বিশেষ আত্মীয়তা ও সৌহার্দ্য ছিল। অমৃতবাবু পরম বৈষ্ণব। তিনি তৎকালে বাগেরহাটের S.D.O. নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগিতায় বাগেরহাটের শ্রীশ্রীগোবিন্দ মন্দিরের ও লাউপালার শ্রীশ্রীগোপাল মন্দিরের কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমি বাগেরহাটে গিয়া অমৃতবাবুর নিকট হইতে সরকারীকার্যের ভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে শ্রীভগবৎ-সেবা বিষয়ক কার্যের হিসাব ও কাগজ-পত্রের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাগেরহাটে শ্রীশ্রীগোবিন্দমন্দির নির্মাণ

অনুমান ১৯১২ সাল। আমি খুলনা P.W.D.-তে কাজ করি। আমার বয়স তখন ২২।২৩ বৎসর। একদিন সকালে বাগেরহাটের এস.ডি.ও. নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত P.W.D. Landing ঘাটে—অপ্রত্যাশিতভাবে আলাপ হইল। তিনি ছিলেন বাগেরহাট সহরে শ্রীশ্রীগোবিন্দমন্দির নির্মাণের প্রথম উদ্যোক্তা এবং লাউপালার শ্রীশ্রীগোপালমন্দির সংস্কারের জন্য সখিচরণ মোহান্তের পর প্রথম সাহায্যের আবেদন-প্রচারক। উঁহার নৌকামধ্যেই আমাদের কথাবার্ত্তা হইল।

বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে উঁহার জ্ঞান ও অনুরাগ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। বহু বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা হইল। শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের শ্রীশ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত গ্রন্থের কয়েক স্থানে যে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের বিরোধ আছে তদ্বিষয়ে আলোচনা হইল। কয়েক ঘণ্টার আলাপে তাঁহাকে আমার কতদিনের পরিচিত ও কত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত অনুভব করিতে লাগিলাম।

বাগেরহাটে শ্রীশ্রীগোবিন্দমন্দির

বাগেরহাটে সরকারীকার্যভার গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দ মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। দেখিলাম, মাত্র মন্দিরটীই নির্মিত হইয়াছে,—অন্য প্রয়োজনীয় গৃহাদির কিছুই হয় নাই। বর্ষার সময় মন্দির-প্রাঙ্গণে এক হাঁটু জল দাঁড়ায়। বর্ষাকালে মন্দিরে যাইতে বাঁশের সাঁকোর সাহায্য লইতে হয়। তখন শ্রীবিগ্রহ জয়পুর হইতে আসেন নাই। শুনিলাম, নীহারবাবু স্বয়ং জয়পুর গিয়াছেন এবং সেখান হইতে যুগলবিগ্রহ পাঠাইয়া দিবেন। কয়েক মাস পূর্বেই নীহারবাবু বাগেরহাট হইতে বদলী হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে তাঁহারই আত্মীয় সুকুমার চট্টোপাধ্যায় S.D.O. হইয়া আসিয়াছেন।

১৯১৫ সালে পুনরায় শ্রীশ্রীগোপাল দর্শন করিতে গেলাম। দুই বৎসর পূর্বে যাহা দেখিয়াছিলাম, বুঝিলাম, গোপালবাড়ীর ও সেবাপূজার অবস্থা তদপেক্ষা অবনতির দিকে চলিয়াছে।

রাংদিয়া পরগণার জমিদারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

রাংদিয়া পরগণার জমিদারী ছিল যশোহর জিলার চাঁচড়ার রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় মহাশয়দের। অনুমান ১২১৮ সালে তাঁহারা কলিকাতাস্থ কালীঘাটের বিশ্বম্ভর হালদারের নিকট রাংদিয়া পরগণা বিক্রয় করেন। কয়েক বৎসর পরে হালদারমহাশয় উহা

কলিকাতার উমানন্দঠাকুর ও হরিমোহন ঠাকুরের নিকট বিক্রয় করেন। ঠাকুরবাবুদের নিকট হইতে কলিকাতার অন্যতম জমিদার ছাতুবাবু লাটুবাবু অর্থাৎ অনাথনাথ দেব বাহাদুর মহাশয়গণ ১২২৮ সালে উক্ত পরগণা খরিদ করেন।

১২৪৯ সালে দেববাহাদুর জমিদারগণ গোবরডাঙ্গার জমিদার মুখোপাধ্যায়বাবুদের নিকট রাংদিয়া পরগণা পত্তনী-পাট্টা প্রদানে জমা-বন্দোবস্ত করেন। পাট্টা দলিলে এই সর্ত লিখিত থাকে যে, পূর্ব পূর্ব জমিদারগণ কর্তৃক প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর যথাযথ-ভাবে বহাল রাখিতে হইবে, এবং কোন প্রকারে তাহার অন্যথা করিলে পত্তনীপাট্টা নাকচ হইয়া যাইবে। গোবরডাঙ্গার মুখার্জি-বাবুরা রাংদিয়া পরগণা পত্তনী জমা লওয়ার পর বাং ১২৭২ সালে যে জরিপ করাইয়াছিলেন তাহাতে শ্রীশ্রীগোপালের নিষ্কর দেবোত্তরের কথা উল্লেখ আছে ও প্রজার নামের ঘরে তৎকালীন সেবাইত সখিচরণ দাস বাবাজীর নাম রেকর্ড করা আছে।

শ্রীমদ্ বালকদাস বাবাজী ও শ্রীশ্রীগোপাল-বিগ্রহপ্রাপ্তি

খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত বাগেরহাট সহরের নিকটবর্তী চরকাটি গ্রামে শ্রীমদ্ বালকদাস বাবাজী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কুলগুরু ছিলেন,—হুগলী জেলার শ্যামসুন্দরপুরের গোস্বামীবংশীয়। বাবাজীর ভ্রাতাদির বংশে কেহ ছিলেন কিনা জানা যায় না।

শ্রীমদ্ নকুলব্রহ্মচারী নামক জনৈক ত্যক্তবৈষ্ণব বাবাজী—লাউপালা গ্রাম ভৈরবনদের তীরে অবস্থিত অতি নির্জন স্থান ও সৌন্দর্যের আকরভূমি দেখিয়া তথায় অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন। শ্রীমদ্ বালকদাস বাবাজীর বাল্যকালেই উক্ত ব্রহ্মচারী মহারাজের সঙ্গলাভের সুযোগ ঘটে এবং পরে তিনি উঁহার নিকট

হইতেই দীক্ষা ও বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করেন। শিষ্যকে ভক্তিমান ও সুপাত্র দেখিয়া তাঁহার উপর শ্রীশ্রীগোপালবিগ্রহের সেবার ভার অর্পণ করিয়া ব্রহ্মচারী মহারাজ তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। (বিস্তৃত বিবরণ "শ্রীমদ্ বালকদাস বাবাজীর জীবনী"তে দ্রষ্টব্য)। ইহা অনুমান বাং ১১৯০ সালের কথা। শ্রীমদ্ বালকদাসের ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠায় প্রীত হইয়া—শ্রীশ্রীগোপাল তাঁহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ভক্তের আনন্দরস বর্ধন জন্য নানা লীলা প্রকাশ করিতেন। ভগবৎ শক্তির প্রভাবে বাবাজী মহারাজ এই নিভৃত পল্লীতে মন্দির ও নাটমন্দির নির্মাণ করিতে ও শ্রীশ্রীগোপালের সেবার সুবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার অতিথিসেবার কথা এতদ্দেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় নিষ্কিঞ্চন ভিখারী বৈষ্ণবের যে প্রকারে অতিথিসেবা নির্বাহ হইত তাহা বিস্ময়কর (তাঁহার জীবনী দ্রষ্টব্য)।

চাঁচড়ার রাজার জমি দান

অনুমান ১২০৮ সালে দেবদ্বিজে ভক্তিমান স্বনামধন্য চাঁচড়ার রাজা নীলকণ্ঠ রায় মহাশয় একটি নৌকার বহর সাজাইয়া বরিশাল জিলাস্থ ঝালকাটি অঞ্চলে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দাড়ি-মাঝি ব্যতীত প্রায় ৩০০ শত লোক ছিল। নৌকার বহরে ও নিজের বজরায় প্রচুর খাদ্যদ্রব্য মজুত ছিল। তিনি রাত্রি যাপন জন্য তাঁহার রাংদিয়া পরগণার যাত্রাপুরস্থ কাছারীর ঘাটে আসিয়া নৌকা বাঁধিলেন। চাঁচড়ার রাজা শুধু রাংদিয়া পরগণার নয়—মধুদিয়া ও চিরুলিয়া পরগণারও মালিক ছিলেন এবং যাত্রাপুরই ছিল তিন পরগণার সদর কাছারী। তখন যাত্রাপুর ও লাউপালা গ্রামের মধ্যস্থ বর্তমান খাল কাটা হয় নাই,—উভয় গ্রাম এক পারেই পরস্পর সংলগ্ন ছিল।

কাছারীর ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া রাজা ২।১ দিন তথায় বিশ্রাম করেন। এমন সময় কাছারীর কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রাজার নিকট বালকদাস বাবাজী মহারাজের অলৌকিক প্রভাব ও বিস্ময়কর অতিথিসেবাদির বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই শ্রীশ্রীগোপালের ও তদ্ভক্ত বালকদাস বাবাজীর মহিমার বৃত্তান্ত যশোহর ও খুলনা জেলার প্রায় সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ধর্মপ্রাণ রাজার ইচ্ছা হইল—তিনি শ্রীশ্রীগোপালের সেবাকার্যের কিছু আনুকূল্য করেন। বালকদাস-সেবিত বিগ্রহ স্বয়ং প্রকাশিত বলিয়াও তিনি শুনিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার মনে ভক্ত ও ভগবানের মহিমা পরীক্ষা করিবার বাসনা জাগিল। তিনি তখন স্বয়ং বাবাজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—"আজ আমরা সকলে গোপালের আতিথ্য গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।" বাবাজী উত্তরে বলিলেন—"সে ত আমার সৌভাগ্য। গোপালের আশ্রম, গোপাল কোন দিন অতিথি প্রত্যাখ্যান করেন না, আপনাদিগকে কোনরূপে একমুষ্টি প্রসাদের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।" ইহা বলিয়া বাবাজী শ্রীশ্রীগোপালের নিকট অতিথি আগমনের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং সেবক গোবিন্দদাসকে বলিলেন—হাড়ি, কড়াই, কাঠ প্রভৃতি বাহির করিয়া রাঁধিবার আয়োজন করিতে। গোবিন্দদাস ম্লান মুখে উত্তর করিলেন,—"বাবা, ভাণ্ডার শূন্য, এক মুষ্টি চাউল পর্যন্ত নাই।" তাহাতে বাবাজী তাহাকে ধম্‌কাইয়া বলিলেন,—"ব্যাটা, বাড়ী কি তোর? যার বাড়ী সে তার ব্যবস্থা করবে; তুই তোর কাজ কর্ গিয়ে। ঐ সকল কথাবার্তার বিবরণ জানিতে পারিয়া রাজা হাসিলেন এবং নিজেদের জন্য যথানিয়ম পাকের ব্যবস্থা রাখিবার আদেশ দিলেন। অতিথিসেবা বিষয়ে গোপালের অনেক অলৌকিক লীলার কথা জানিতেন বলিয়া বাবাজীর লোকজন ধৈর্য ধারণ

করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল—কয়েকজন লোক নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার মাথায় লইয়া শ্রীশ্রীগোপালমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল—খুলনা জিলার উজল-কুড় গ্রামের 'ভাইয়া' পরিবার হইতে একটি শিশুর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে গোপালভোগ দিবার জন্য ৩।৪ খানি নৌকা ভর্তি করিয়া বহুবিধ খাদ্যসামগ্রী ও লোকজন আসিয়াছে। শ্রীশ্রীগোপাল দর্শন ও প্রণাম করিয়া তাহারা বলিলেন,—"আমাদের বংশে বহু দিন যাবৎ কোন পুত্রসন্তান হয় নাই; তন্নিমিত্ত গোপালের নিকট মানত করিয়াছিলাম যে, বংশে পুত্রসন্তান হইলে গোপালকে ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ দ্বারা পুত্রের অন্নপ্রাশন করাইব। গোপালের অশীর্বাদে আমাদের ছোট ভাই-এর একটি পুত্রলাভ হইয়াছে। তাহার অন্নপ্রাশন উদ্দেশ্যে আমরা আসিয়াছি। আমাদের সঙ্গে প্রায় ৪০০ শত জনের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী আছে। প্রতিকূল স্রোত ও বায়ুর জন্য আমাদের পৌঁছাইতে বিলম্ব হইয়াছে। এমন কয়েকটি জিনিস আছে যাহা আর বেশী বিলম্ব হইলে নষ্ট হইয়া যাইবে। এইক্ষণ আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আদেশ করুন।" এই সকল কথা শুনিয়া বাবাজী হাসিয়া বলিলেন —"বাবাসকল, ব্যস্ত হইও না, গোপাল পূর্ব হইতেই সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।" বাবাজী মহারাজের অনুরোধে রাজাবাহাদুরের নৌকা হইতে পাচকগণ যাইয়া ঐ-সকল দ্রব্যদ্বারা নানাবিধ ভোজ্য রন্ধন করিলেন। তদ্দ্বারা শ্রীশ্রীগোপালের ভোগ দেওয়া হইল। রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় সগোষ্ঠী প্রসাদ পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং বাবাজী মহারাজের ও শ্রীশ্রীগোপালের অলৌকিক মহিমা দর্শন করিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ১২০৯ সালে রাজা দেশে ফিরিয়া বাগেরহাট থানার অন্তর্গত বাহুখালি মৌজায় ৮১/ বিঘা ধানী জমি শ্রীশ্রীগোপাল সেবার জন্য দেবোত্তর করিয়া দিলেন। (তায়দাদে আছে)।

ইহা ছাড়া ১৮/ বিঘা জমিও রথের মেলা ও মন্দিরের জন্য দান করিয়াছিলেন।

মন্দিরসংলগ্ন জমি দান

রাংদিয়া পরগণার জমিদারী যখন কলিকাতার কালীঘাটের বিশ্বম্ভর হালদারবাবুদের ছিল, তখন অনুমান বাং ১২২০ সালে তাঁহারা শ্রীশ্রীগোপাল ও তদীয় ভক্তসেবকের মহিমা শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীগোপালমন্দির-সংলগ্ন ৮।০ সওয়া আট বিঘা জমি শ্রীশ্রীগোপালকে দান করেন।

মঘিয়ার জমিদারের জমি দান

বাগেরহাট মহকুমাস্থ মঘিয়া গ্রামের বাসুকী গোত্রীয় জমিদারবাবুগণ শ্রীশ্রীগোপাল ও তদীয় সেবকের বহু অলৌকিক মহিমা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগোপালকে ৮/ বিঘা জমি দান করেন।

গোবরডাঙ্গার জমিদারের জমি দান

অনুমান বাং ১২৪৫ সালে রাংদিয়া পরগণার জমিদারী গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায়বাবুদের হস্তগত হওয়ার পর কালী-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যাত্রাপুর কাছারীতে আসেন। তথায় লোকমুখে শ্রীশ্রীগোপালের বহুবিধ মহিমা ও বাবাজীর বহুবিধ অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি বিস্মিত হন; পরে নিজে পরীক্ষাদ্বারা মুগ্ধ হইয়া রামপাল থানার অন্তর্গত মধুদিয়া পরগণার মদনাখালি মৌজার ২১/ একুশ বিঘা ধানী জমি শ্রীশ্রীগোপালের সেবার্থে দান করেন। রাংদিয়া পরগণা পত্তনীস্বত্ব বিধায় তথা হইতে কোন জমি দান করা সম্ভবপর ছিল না (বিশেষ বিবরণ বালকদাস বাবাজীর জীবনীতে দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমদ্ বালকদাস বাবাজীর অপ্রকট ও পরবর্তী মোহান্তধারা

মদনমোহন ও গোবিন্দদাস মোহান্ত :—শ্রীমদ্ বালকদাস বাবাজী মহারাজ ১২৫৯ সালে ফাল্গুনী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার অপ্রকটের পর হইতে শ্রীশ্রীগোপালবাড়ীতে পূর্ণিমার দোল ও তাঁহার অপ্রকট-তিথি বলিয়া অষ্টমীর দোল-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের পর মদনমোহন দাস বাবাজী মোহান্ত হয়েন। কয়েক বৎসর পরে তিনি গোবিন্দদাস বাবাজীকে মোহান্তপদে বরণ করিয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। সেই সময় হইতে গোবিন্দদাস বাবাজী একনিষ্ঠভাবে শ্রীশ্রীগোপালসেবা পরিচালন করিতেন। অনুমান ১২৬৯ সালে তিনি অপ্রকট হন। তখন যাত্রাপুরের খাল কাটা হয় নাই। 'কুঞ্জবাড়ী' নামে যে স্থান অদ্যাপি বর্তমান আছে, সেই পর্যন্ত রথ টান হইত। খালকাটার পরেও ঐ জমি গোপালের ছিল। পরে ঐ জমি গোপালের পক্ষ হইতে প্রজাপত্তন করা হয়।

সখিচরণ দাস মোহান্ত

বাং ১২৬৯ সালে সখিচরণ দাস বাবাজী শ্রীশ্রীগোপালবাড়ীর মোহান্ত-পদ প্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন শ্রীমদ্ ভাগবতে পণ্ডিত ও ভজনানন্দী ভক্ত। তিনি প্রায় ৪২ বৎসর ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মোহান্ত-পদ লাভ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীগোপালসেবাদির জন্য নানা চেষ্টা ও নিজ নামে মোকদ্দমাদি পরিচালনা করেন। খুলনা তখন জেলায় পরিণত হয় নাই। মোকদ্দমার কাগজপত্রে দেখা যায়—জেলা যশোহর, মহকুমা বাগেরহাট। ইং ১৮৭৪ সালে তিনি রামদয়াল অধিকারী নামক এক ব্যক্তির নামে খাসদখলের মোকদ্দমা

করিয়াছিলেন। আরজীতে আছে—"আমি ১২ বৎসরের অধিক কাল দখলিকার আছি।"

সখিচরণ মোহান্ত শ্রীশ্রীগোপালের সম্পত্তির আয় হইতে ও ভিক্ষালব্ধ অর্থের দ্বারা রাংদিয়ায় গভর্ণমেন্ট খাস মহলের ২৫/ পঁচিশ বিঘা ধানীজমি ক্রয় করেন। শ্রীশ্রীগোপালের সেবার কার্যাদি ও পুষ্করিণীখনন জন্য ইং ১৮৭৫ সালে তৎকালীন এস.ডি.ও. কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়, মুনসেফ রাজেন্দ্রনাথ সাধু ও প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, সাব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সারদানন্দ দাসগুপ্ত, উকীল দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং নিজের ও অপরাপর অনেক বিশিষ্ট লোকের স্বাক্ষর মতে সখিচরণ মোহান্ত এক আবেদনপত্র বাহির করেন। কুমুদবাবু এস.ডি.ও. বদলী হইলে নূতন এস.ডি.ও. কালিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সময় তাঁহার ও অন্যান্য মুনসেফ, সাব-ডেপুটী ও উকীলবাবুদের স্বাক্ষরমতে দ্বিতীয় আবেদনপত্র প্রকাশ করেন। তারপর খুলনার উকীল নলধাগ্রামনিবাসী রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর মহাশয়ের একার স্বাক্ষরে আর এক আবেদনপত্র প্রচার করেন। এই প্রকারে যে অর্থ সংগ্রহীত হয় তদ্দ্বারা তিনি মন্দিরের সংস্কারকার্য আরম্ভ করেন; কিছুটা সংস্কারকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগোপালজীউর সেবার জলের জন্য তিনি ইং ১৮৯৭ সালে পুষ্করিণী সংস্কারের কার্যে অগ্রণী হন; কিন্তু অর্থের অনটনে ঐ বৎসর রাংদিয়া পরগণার জমিদার অন্নদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গোপালের সকল সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ২০০৲ কর্জ লয়েন। কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ দেনা পরিশোধ করিয়া সকল সম্পত্তি দায়মুক্ত করিয়াছিলেন। কর্জ লওয়া অর্থের দ্বারা পুষ্করিণী সংস্কারের কার্য সম্পন্ন হয়। বন্ধকী দলিলের গ্রহীতা—বাবু অন্নদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, দাতা শ্রীসখিচরণ দাস মোহান্ত। বাং ১২৯৮।৪ঠা শ্রাবণ, ইং ১৮৯১।১৯শে জুলাই, Regd. in Book No. 1, Being No. 2597 for

1891, Vol. 28, Page 92-96, signed 22. 7. 91. (কুলিদের সহিত কার্যের চুক্তিনামা (agreement) দলিলখানা অন্যান্য দলিলসহ রক্ষিত আছে।)

সখিচরণ দাস বাবাজীর চরিত্র ও অপ্রকট

সখিচরণ দাস মোহান্ত শ্রীমদ্‌ভাগবতের পণ্ডিত, বক্তা ও সুপুরুষ ছিলেন। পরম ভাগবত রাইচরণ অধিকারী মহাশয় তাঁহার নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন। অধিকারী মহাশয়ের পাঠ-ব্যাখ্যা শ্রবণ ও তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ভজনশীল বৈষ্ণব। সখিচরণ দাস বাবাজীর সময় দ্বারিকা অধিকারী নামক একজন রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পূজারী ছিলেন। মোহান্তজী পূজারীকে তাঁহার বাল্যকাল হইতেই আপন পুত্রবৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোহান্তজী বৃদ্ধাবস্থায় ইং ১৯০২ সালে উক্ত দ্বারিক অধিকারীকে শ্রীশ্রীগোপাল-সেবার ভার অর্পণ করেন; শ্রীশ্রীগোপালজীউর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহাকে এক উইলও করিয়া দেন। কিন্তু কি জানি —কি অভিপ্রায়ে তিনি ইং ১৯০৬ সালে সীতানাথ চক্রবর্তী নামক এক অগ্রদানী ব্রাহ্মণের নামেও ঐ মর্মে এক উইল সম্পাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয় গোপালসেবার জন্য কখনো ওখানে আসেন না। (1st Will regd. in Book No. 3. Vol. I for 1900, Page 52 and 53. Being No. 9 for 1902. Signed 4. 9. 1902. 2nd will regd. in Book No. III. Vol. I for 1900. Page 57-58. Being No. 2 for 1903. Signed 26. 9. 03.)

সখিচরণ বাবাজী ইং ১৯০৭ সালে অপ্রকট হয়েন। তদবধি দ্বারিক অধিকারীই মোহান্তরূপে কাজ করিতে থাকেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তজ্জন্য তিনি দামোদর দাস নামক এক

ব্যক্তিকে পূজারী নিযুক্ত করেন। দামোদর শ্রীশ্রীগোপালের ভোগরন্ধন ও পূজার্চনাদি করিতেন। এই ভাবে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত শ্রীশ্রীগোপালজীউর সেবাকার্য নির্বিঘ্নে নির্বাহ হইতে থাকে।

রাংদিয়ার জমিদারের গোপালবাড়ীতে কর্তৃত্ব করিবার প্রথম প্রয়াস

সখিচরণ মোহান্ত মহারাজ ইং ১৮৭৫ সালে সাহায্যের আবেদন পত্র প্রচার করিয়া গোপালমন্দিরের সংস্কার কার্যাদি যাহা কিছু সম্পন্ন করিয়াছিলেন, ১৯০৩ সালের প্রবল ভূমিকম্পে তাহার অনেক নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু বার্ধক্যজনিত শারীরিক অক্ষমতাহেতু তিনি উহার মেরামতের আর কোন ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সময় জমিদার-কর্মচারিগণের সহিত সখিচরণ বাবাজীর সদ্ভাব থাকায় তিনি গোপালজীউর দলিলপত্র ও গহনাদি জমিদার-কাছারীতেই রাখিতেন। পর্ব ও উৎসবোপলক্ষে গহনা ও বৈষয়িক প্রয়োজনে দলিলাদি কাছারী হইতে আনিতেন। এই সময় দ্বারিকের শরীর অসুস্থ হওয়ায় এবং গোপালবাড়ীতে অসুস্থাবস্থায় বাসোপযোগী গৃহ না থাকায় তিনি গোপালবাড়ীসংলগ্ন স্থানে একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। দামোদর পূজারী থাকিতেন গোপালভবনের অভ্যন্তরে।

ইং ১৯০৮ সাল। কেশবলাল মুখোপাধ্যায় নামক একব্যক্তি যাত্রাপুর কাছারীর নায়েব হইয়া আসিয়া গোপালবাড়ীর পুকুরে বড় বড় মাছ আছে জানিতে পারিয়া তাহা ধরিবার জন্য লোকজন পাঠাইলেন। মোহান্ত দ্বারিকানাথ তাহাতে আপত্তি জানাইলেন। মোহান্তজীর আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা মাছ ধরিতে আরম্ভ করিল। মোহান্তজী দামোদর পূজারীকে নায়েব ও তৎ-প্রেরিত

লোকদের নামে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ফৌজদারী করিতে পাঠাইয়া দিলেন। নালিশ দায়ের করিয়া পূজারী বাগেরহাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, গোপালবাড়ীর সদর দরজা বন্ধ। নায়েবের লোকেরা দরজা বন্ধ করিয়া পূজারীকে শুধু ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেয় না, তাহা নহে—তাঁহাকে নানারূপ ভীতি-প্রদর্শনও করে। বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া পূজারী পুনরায় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া সকল কথা জানাইলেন। তখনই মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ পাঠাইয়া পরদিনই তদন্তের রিপোর্ট দিবার আদেশ দিলেন। পুলিশ অবিলম্বে গোপালবাড়ী আসিলেন এবং প্রমাণাদি নিয়া নায়েব ও তাহার লোকজনের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিলেন। নায়েব ও ৭।৮ জন লোকের নামে আসামী ধৃত করিবার পরওয়ানা বাহির হইল। পরস্পর এই সংবাদ শুনিয়া আফ্‌রা নিবাসী রাধিকানাথ ঘোষ মহাশয়ের উপর কাছারীর সাময়িক ভার অর্পণ করিয়া নায়েব মহাশয় সদলে সরিয়া পড়িলেন।

কয়েকদিন পরে কাছারীর কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ভদ্রলোকদিগকে লইয়া দ্বারিক অধিকারী ও দামোদর পূজারীকে ধরাধরি করিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলেন। এইরূপে হতমান হওয়ার পর হইতে জমিদারের কর্মচারীদের মনে গোপালবাড়ীতে কর্তৃত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। ইহার কিছুদিন পরে দামোদর পূজারীকে মোহান্ত করিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার দ্বারা কাছারীর কর্তৃপক্ষ কি একটা লিখাইয়া লয়েন। এই সময় দামোদর একাকী সকল সেবাকার্য করিতে অক্ষম হওয়ায় তিনি বিহারীদাস ব্রজবাসী নামক এক ব্যক্তিকে গোপালসেবার সহায়করূপে নিযুক্ত করেন। দ্বারিক তখনও মোহান্ত আছেন এবং দেবোত্তর সম্পত্তি তাঁহার নামেই চলিতে থাকে; কিন্তু জরাজীর্ণ হইয়া পড়ায় তিনি কাজকর্ম কিছুই করিতে পারিতেন না।

দামোদর পূজারীর অপ্রকট

ইং ১৯১১ সালে দামোদর অপ্রকট হন। তাহার পর বিহারী দাস ব্রজবাসী একাকী সেবার কার্য চালাইতেন। তাঁহার নিকট জমিদারের কর্মচারী জমিদারের কর্তৃত্ব-স্বীকারে জমিদার বরাবরে এক দলিল করিয়া দিতে বলেন। ব্রজবাসী টালবাহানা করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীগোপালের ইচ্ছায় ১৯১২ সালে নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী পরম সজ্জন ব্যক্তি বাগেরহাটের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। বিহারী পূজারী তাঁহাকে জমিদারের কর্মচারীর অভিসন্ধির বিষয় জ্ঞাপন করেন। নীহারবাবু পূজারীকে জমিদার বরাবরে কোন দলিল দিতে নিষেধ করেন। গভর্নমেণ্ট দ্বারিক অধিকারী মোহান্তের নিকট গোপালের সম্পত্তির বিবরণসহ সেস-রিটার্ণ চাহেন। সকল দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণসহ মোহান্তজী পরবৎসর সেস-রিটার্ণ দাখিল করেন। (Certified copy printed in High Court Appeal from Decree No. 75 of 1924. Paper Book Pages 40-43.)

গোপালবাড়ীর সংস্কার ও নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নীহারবাবু বৈষ্ণব ও ভক্ত। শ্রীশ্রীগোপালজীউর মাহাত্ম্যের কথা পরস্পর অবগত হইয়া তৎকালীন ওভারসিয়ার অমৃতলাল মিত্র মহাশয়সহ একদিন নীহারবাবু শ্রীশ্রীগোপাল-দর্শনে আসেন। গোপালবাড়ীর মন্দিরাদির শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া তিনি ভাবাবেগে অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। মন্দিরের ছাদ ভেদ করিয়া বর্ষার জল পড়ে, পূর্বতন মোহান্ত মহারাজদের সমাধিগুলি ভগ্নপ্রায়, নাটমন্দির জীর্ণ ও পতনোন্মুখ, ভোগমন্দির ভূতলশায়ী। তিনি বলিলেন—"ওভারসিয়ারবাবু, ইহার কি কোন প্রতিকার করা যায় না?" অমৃতবাবু উত্তর দিলেন—"আপনি উদ্যোগী হইলে অবশ্যই ইহার প্রতিকার হইতে পারে।"

নীহারবাবুকর্তৃক সাহায্যের আবেদন

মন্দিরাদির সংস্কারজন্য নীহারবাবু ইং ১৯১৩ সালে নিজ নামে সাহায্যের আবেদন-পত্র প্রচার করেন। হিন্দুসাধারণের নিকট হইতে ১৫৬৲ টাকা সংগ্রহীত হইল। রাংদিয়া পরগণার জমিদারবাবুর নিকট মুদ্রিত আবেদন-পত্র পৌঁছাইয়া দিলে তিনি যাত্রাপুর কাছারীর নায়েবকে ২০০৲ টাকা দিয়া দিবার জন্য বলেন। নায়েব ধরণীধর ঘোষ মহাশয় উক্ত ২০০৲ টাকা নগদ না দিয়া সংগ্রহীত ১৫৬৲ টাকা ও প্রতিশ্রুত ২০০৲ টাকা মোট ৩৫৬৲ টাকাদ্বারা মন্দির মেরামতের কাজটী নিজে দেখিয়া বুঝিয়া করাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। নীহারবাবুর অনুরোধে বাগেরহাটের প্রবীণ উকীল শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্ট-চুক্তিপত্রের এক মুসাবিদা করেন এবং ধরণীবাবু উহা সই করেন।* ধরণীবাবুকে কার্য বুঝাইয়া দিতে ও মেরামতের কার্য বুঝিয়া লইতে নীহারবাবু ওভারসিয়ার অমৃতলাল মিত্র মহাশয়কে অনুরোধ করেন। তখন বাগেরহাটে সর্বদা ইট, চূন প্রভৃতি মেরামতের উপকরণ পাওয়া যাইত না, খুলনা সহর হইতে আনাইতে হইত। মানসায় ভৈরব নদে জলের অল্পতায় চূন-সুরকী-বোঝাই বড় নৌকা বৎসরের সকল সময় ভারাইত না। চূন-সুরকী সংগ্রহের অসুবিধার জন্য ধরণীবাবু অমৃতবাবুকে তাঁহার অপারগতার কথা পোষ্টকার্ড লিখিয়া জানাইলেন।✣ অতঃপর অমৃতবাবু খুলনা হইতে সামান্য পরিমাণ ইট, চূন ও সুরকী আনাইয়াছিলেন, কিন্তু মেরামতের কোন কাজ তখন আরম্ভ করিতে পারেন না।

সংস্কারকার্যে নীহারবাবুর বিরতি

বাগেরহাটের বহু ভদ্রলোক বাগেরহাট সহরে একটি বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিবার জন্য নীহারবাবুকে অনুরোধ

---

* এই দস্তখতী চুক্তিপত্রখানা দলিলাদির মধ্যে আছে।

✣ এই পোষ্টকার্ডখানা দলিলাদির মধ্যে আছে।

করায় তিনি বাগেরহাটে শ্রীশ্রীগোবিন্দমন্দির স্থাপনকার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত গোপালবাড়ীর সংস্কারকার্যে দৃষ্টি দেওয়া তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। বাগেরহাটে মন্দির-প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর শ্রীবিগ্রহ আনয়নের পূর্বেই তিনি ১৯১৫ সালে ছুটি নিয়া বাগেরহাট হইতে চলিয়া যান।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সুকুমারবাবুর আগমন ও মন্দিরকমিটী গঠন

ইং ১৯১৫ সালে নীহারবাবুর স্থানান্তর গমনের পর তাঁহারই আত্মীয় সুকুমার চট্টোপাধ্যায় S.D.O.-রূপে বাগেরহাটে আসেন।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে,—আমি ১৯১৫ সালে বাগেরহাট লোকালবোর্ডে অস্থায়ী সাব-ওভারসিয়ার হইয়া আসি। তখন সুকুমারবাবু বাগেরহাটের S.D.O. ও লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান। আমার বাল্যকাল হইতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা ছিল। যখন আমার বয়স ১৬।১৭ বৎসর তখন হইতেই কিভাবে গঙ্গাতীরে আশ্রম করা যায় তাহা নিয়া আমার কয়েকজন বন্ধুর সহিত কল্পনাজল্পনা করিয়া অনেক রাত্রি অতিবাহিত করিতাম। ঐরূপ কল্পনাতেও অনির্বচনীয় আনন্দ পাইতাম। বন্ধুগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন অন্যতম। সত্যেনবাবু পরে এম্-এ, বি-এল, ডিগ্রী লাভ করিয়া 'হিতবাদী' ও 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং বহু বৈষ্ণবগ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। হৃষিকেশ রায়চৌধুরী ছিলেন বন্ধুগণের অন্যতম, কিন্তু তিনি পাঠ্যাবস্থাতেই অপ্রকট হয়েন। যোগেন্দ্রনাথ মালো ও শশিভূষণ দেও আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আমার বাল্য-কালে নিজগ্রামেও শ্রীশ্রীহরিসভা, লাইব্রেরী ও সেবাশ্রম ইত্যাদি সামান্যাকারে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

বাগেরহাটে আসিবার ২।৩ দিন পরে আমার সেই আশ্রম করিবার বাসনা বলবতী হইল। আমার পরমবন্ধু যোগেন্দ্রনাথ মালোকে নিয়া মুনিগঞ্জ খালের উত্তরধারে ভৈরব নদের তীরে স্থান খুঁজিতে লাগিলাম। যোগেনদার সহিত আমার এমন একটা মিল ছিল,—যেন আমার ইচ্ছাই যোগেনদার ইচ্ছা। যোগেনদার চরিত্র সাধুচিত, উদার, কোমল, সরল ও স্নেহপূর্ণ ছিল। তাঁহার মধুর ব্যবহারের কথা মনে হইলে আজিও হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে।

কয়েকদিন পর S.D.O. সুকুমারবাবুকে নিয়া গোপাল-মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। পূর্বেই বলিয়াছি,—ব্যবহারিক কার্যের ভার অমৃতবাবুর নিকট হইতে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বাগের-হাটের গোবিন্দমন্দির ও লাউপালার গোপালমন্দিরের হিসাব-পত্রের ভারও আমার উপর অর্পিত হয়। সংস্কার অভাবে গোপালমন্দিরাদির শোচনীয় অবস্থা ও সেবাদির দুরবস্থার কথা বলিয়া তাঁহাকে সব দেখাইলাম। মন্দির-সংলগ্ন স্থানাদি দেখিয়া মনে হইল—আমার বাল্যকালের আশ্রমের স্বপ্ন সফল করিবার উপযুক্ত স্থান ইহাই। সুকুমারবাবুকে বিশেষভাবে বুঝাইলাম যে, হিন্দু জনসাধারণের মধ্য হইতে একটি কমিটী না হইলে গোপালের কাজে সাধারণের সহানুভূতি পাওয়া কঠিন। ইহার কিছুদিন পরে সুকুমারবাবু ইউনিয়ন কমিটীর চেয়ারম্যান, লোকাল বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান, চৌকিদারী ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট, যাত্রাপুর কাছারীর নায়েব ও কর্মচারী ও স্থানীয় হিন্দু-সাধারণকে সংবাদ দিয়া ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গোপালবাড়ীর ভগ্ন নাটমন্দিরে একটি সভা আহ্বান করেন। ওই সভায় জমিদার কাছারীর প্রধান কর্মচারী ধরণীধর ঘোষ ও অন্যান্য কর্মচারিগণ ইউনিয়ন কমিটীর চেয়ারম্যান কার্তিকদীয়ানিবাসী পণ্ডিত বিপিন-বিহারী ভট্টাচার্য, বাগেরহাট-লোকালবোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান

কোমরপুরনিবাসী বিপিনবিহারী বসু, রাংদিয়া হাইস্কুলের শিক্ষক চাপাতলা নিবাসী লোকনাথ দে, গোপালবাড়ীর মোহান্ত দ্বারিকানাথ অধিকারী, পূজারী বিহারীলাল ব্রজবাসী, লাউপালার কালিদাস চৌধুরী ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এবং মোহান্তজীর অনুমোদনে নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া গোপালবাড়ীর কমিটী গঠিত হয়ঃ

১। শ্রীযুত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় (S.D.O.) সভাপতি
২। " ধরণীধর ঘোষ (কাছারীর নায়েব)
৩। " বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য
৪। " বিপিনবিহারী বসু
৫। " উপেন্দ্রনাথ কর

(উক্ত কমিটীর বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।)

সেই সভার অধিবেশন ও কমিটীগঠনের দৃশ্য যেন আজিও আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে। সভার পর শ্রীশ্রীগোপালজীউর সকল সম্পত্তির বিবরণ ও আয়-ব্যয়ের একটী হিসাব ধরণী বাবুর নিকট হইতে অবগত হইবার জন্য সেই দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, সৎসাহসী ব্রাহ্মণ যুবক এস.ডি.ও. তাঁহার গলাবন্ধ ও জামা খুলিয়া পৈতা হাতে ধরিয়া সর্বসমক্ষে ধরণীবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখুন, আমি বাহ্মণ, গোপাল সামনে আছেন, আপনি তাঁহার সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহাকিছু অবগত আছেন তাহার যথাযথ বিবরণ দিবেন; যদি না দেন, তবে পরকালে যাহা হইবে তাহাত বুঝিতেই পারেন, আর ইহকালেও সত্যগোপনে আমাদ্বারা যথেষ্ট ক্ষতি হইতে পারে, জানিবেন।"

পরে ধরণীবাবু একটি বিবরণী দাখিল করেন। ঐ বিবরণ পরে কমিটীর অনেক কাজে আসিয়াছে। সভার দুই সপ্তাহ পরে সুকুমারবাবু আবার গোপালবাড়ীতে আসিয়া একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বলিয়া খুব দৃঢ়ভাবে বলিয়া-

ছিলেন যে, একবৎসরে তিনি আমাকে অন্ততঃ দশহাজার টাকা তুলিয়া দিবেন। কয়েকমাস যাইতে না যাইতেই দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিলেন—"ওভারসিয়ারবাবু, আমার দ্বারা আর গোপালসেবার কাজ হইতে পারিল না, আমাকে টেলিগ্রাফে বদলি করিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আমার মনের অবস্থা যে কি হইল, তাহা একমাত্র গোপালই জানেন।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সুশীলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আগমন ও শ্রীশ্রীগোবিন্দমন্দির

সুকুমারবাবু বাগেরহাট হইতে চলিয়া যাইবার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে নীহারবাবু জয়পুর হইতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহ পাঠাইয়া দেন। মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার মত আবশ্যক গৃহাদি তখনও প্রস্তুত করা যায় নাই। ভোগগৃহ, সেবাইতের বাসগৃহ ও পায়খানার অভাব। বর্ষার সময় মন্দিরের সম্মুখভাগে হাঁটু-সমান জল জমে, রেলষ্টেসন-রাস্তা হইতে মন্দিরাভিমুখে আসিবার পথ বর্ষাকালে খালের মত হয়; বাঁশের চারের সাহায্য-ব্যতীত মন্দিরে পৌঁছান সম্ভব হইত না। মোক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া ধোপাবাড়ী হইতে মন্দির পর্যন্ত পৌঁছিতেও কমপক্ষে ২০ হাত লম্বা বাঁশের চার তৈরী করিতে হইত। নবাগত এস.ডি.ও. সুশীলবাবুকে মন্দির কমিটীর সভাপতি পদে বরণ করা হইল এবং ব্রজেনবাবু প্রমুখ কয়েকজনের সহিত পরামর্শক্রমে ভোগরান্নার জন্য একখানা ও পূজারীর বাসগৃহ একখানা প্রস্তুত করা হইল। সুশীলবাবু ও ভক্তবৃন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জিনিসপত্র আনিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। ঘাটভোগনিবাসী জমিদার ও বৈষ্ণবভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া আমি কলিকাতায় গেলাম। বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম.এ. মহাশয়কে সঙ্গে নিয়া শ্রীল

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও প্রভুপাদ সত্যানন্দ গোস্বামী মহোদয়গণের সহিত আলোচনা করিয়া শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবস্থাপত্র লইলাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সিংহাসন, পরিধেয় বসন, ভোগের বাসনপত্র প্রভৃতি আবশ্যক জিনিস ক্রয় করিয়া বাগেরহাটে ফিরিলাম। ত্রৈলোক্য-বাবু, তাঁহার গুরু-ভ্রাতাগণ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ উপস্থিত থাকিয়া শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করিলেন। এই সময় হইতে বাগের-হাটের শ্রীশ্রীগোবিন্দের সেবাদিকার্য দেখাশুনার ভার আমার উপর অর্পিত হইল।

মন্দির-কমিটীর দ্বিতীয় অধিবেশন ও সভাপতিপদে এস.ডি.ও. সুশীলচন্দ্র ঘোষ

ইং ১৯১৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর গোপালবাড়ীতে শ্রীশ্রীগোপাল-মন্দির-কমিটীর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সুশীল-চন্দ্র ঘোষ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সুশীলবাবু মন্দির-কমিটীর সভাপতিপদে, সাব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হরিশচন্দ্র সরকার সম্পাদকপদে এবং যাত্রাপুর কাছাস্থীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ধরণীধর ঘোষ সহকারী সম্পাদকপদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। মুনসেফ রবীন্দ্রনাথ ধর মহাশয় উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু হাইকোর্ট-নিয়মাবলীর নিষেধ উল্লেখ করিয়া তিনি কমিটীর কোন সভ্যপদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হন।

কমিটীর সভাপতি সুশীলবাবু ও মুনসেফ রবীন্দ্রবাবু মাঝে মাঝে গোপালবাড়ীতে গিয়া সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিতেন। গোপালবাড়ীর টাকাপয়সা ও হিসাবপত্র ধরণীবাবু রাখিতেন। সুশীলবাবু তাঁহাকে হিসাবপত্র দেখাইতে বলিতেন, কিন্তু ধরণীবাবু নানা অজুহাতে সময়ক্ষেপ করিয়া যাইতেন। সেবার সুব্যবস্থা

করিবার জন্য আমরা ধরণীবাবুকে অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁহার অবহেলায় ৩।৪ বৎসর পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন কার্যই করা সম্ভব হয় না।

শ্রীশ্রীহরিকথা ও নামযজ্ঞ প্রচার

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণায় ভগবদ্ কথা ও তাঁহার নাম প্রচারের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বুঝিতে লাগিলাম। উহা প্রচার ব্যতীত গোপালসেবার সৌকর্যসাধন সম্ভব নহে। মহাপ্রভু-প্রচারিত ধর্ম ও তাহার সাধন তৎকালে তথাকথিত উচ্চবর্ণের মধ্যে একেবারেই সমাদৃত ছিল না। গৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য কতিপয় চিহ্নিত ভক্তের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা করাইয়া দিলেন। ভক্তবৃন্দের নিঃস্বার্থ ও নিরলস সেবা দেশের মধ্যে একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগাইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সজ্জনগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :— কার্তিকদীয়ার গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য, রসিকলাল নাথ কবিরাজ, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মশিদপুরের জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, কাটপাড়ার বিশ্বম্ভর বসু, পাইকপাড়ার হরিনাথ দেব, স্বল্পবাহিরদিয়ার পঞ্চানন হুই, মুলঘরের প্রতাপচন্দ্র দেব, নলধার ভূপেন্দ্রনাথ রাহা, গিলাতলার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, আমীরপুরের মতিলাল দত্ত, মহেশ্বর-পাশার নীলাম্বর রাহা ও অন্নদাচরণ রাহা, কোধলার কৃষ্ণচন্দ্র নাথ, রহিমাবাদের পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ, ও বলরাম নাথ, বারুইপাড়ার যতীন্দ্রনাথ রায়, পাইকপাড়ার শশিভূষণ দেবনাথ ভাগবতরত্ন, বেলফুলিয়ার শশিভূষণ দে, গোটাপাড়ার সদানন্দ অধিকারী, কালিদাস চৌধুরী, সতীশচন্দ্র দাস ও কেশবলাল দাস, বৈটপুরের মণিভূষণ দে, রাড়ীপাড়ার নৃত্যলাল ঘোষ ও সতীশচন্দ্র বসু, দৈবজ্ঞহাটীর মহেন্দ্রনাথ গুহ, খালিসপুরের সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ভাগবতরত্ন, বাগেরহাটের অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রফুল্ল কুমার দত্ত।

তৎকালে দেশে এমন অবস্থা ছিল যে মহাপ্রভু-উপদিষ্ট কলিযুগ-পাবন তারকব্রহ্ম 'হরেকৃষ্ণ' নাম অনেকেরই জানা ছিল না। কীর্তন গায়কদের মধ্যেও কেহ কেহ ঐ নাম পূর্ণভাবে জানিতেন না। নামযজ্ঞের সময় কীর্তন গান করিবার জন্য আসরে যাইবার পূর্বে কিছুসময় প্রায় প্রত্যেক দলের লোকদিগকে বত্রিশ অক্ষরের মহামন্ত্র অভ্যাস করাইতে হইত। ঐ সকল দলের সহিত আমাদের কেহ না কেহ থাকিতেন—যাহাতে নামভঙ্গ দোষ না ঘটিতে পারে। কলিযুগের উপাস্য ও উপাসনা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—কলিযুগের উপাস্য গৌর ও সঙ্কীর্তন যজ্ঞই উপাসনা। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও বারংবার বলিয়াছেন—"সঙ্কীর্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।" আমাদের অনুষ্ঠিত নাম-যজ্ঞগুলিতে যাহাতে কোন প্রকার ব্যবসাবুদ্ধি প্রবেশ করিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। এমন কি কোন দলকে পাথেয় পর্যন্ত দিবার ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনকে সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে সংকীর্তন যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর শ্রীগোবিন্দকে আরাধনার নিমিত্ত যোগদান করেন সেই ভাবই সকলের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইত। অতি দরিদ্র ব্যক্তিও যাহাতে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক হন, তজ্জন্য সর্বভাবে অনাড়ম্বরে যজ্ঞ সম্পাদন করিবার চেষ্টা করা হইত। প্রথম প্রথম আমরা নিয়ম করিয়াছিলাম যে, যিনি নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি সমর্থ বা ইচ্ছুক হইলেও ভোগে দই সন্দেশ প্রভৃতি মূল্যবান খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না। কারণ, ২।১ জনে মূল্যবান খাদ্য-দ্রব্যের আয়োজন করিতে থাকিলে অসমর্থ ব্যক্তিগণ নামযজ্ঞের আয়োজনে ভীত হইয়া পড়িতে পারেন। আমরা নামযজ্ঞ চলিতে থাকাকালে কেবলমাত্র গ্রামের অনায়াসলব্ধ শাক, তরকারী ও চালতা বা তেঁতুলের টকের আয়োজন করিতাম এবং

মহোৎসবদিবসে অল্প পরিমাণ খেজুররস বা দুধের পরমান্ন ভোগ লাগাইতাম।

জমিদার-কাছারীকর্তৃক বিহারী পূজারীকে বিতাড়ন ও সীতানাথ চক্রবর্তীকে পত্তন

১৯১৮ সালে আমি প্রায়ই জ্বরাক্রান্ত হইতাম; তৎসত্ত্বেও চাকুরীর কার্য ও নামযজ্ঞ উভয়ই চালাইয়া যাইতাম। S.D.O. সুশীলবাবু আমাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন—"অসুস্থ শরীর নিয়া এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করা ঠিক নয়, একখানা নৌকা নিয়া সুন্দরবন অঞ্চলে ঘুরিয়া আসুন; আমি যতদিন আছি, ততদিন আপনাকে ছাড়িব না।" ওই বৎসরের শেষভাগেই তিনি বদলী হইয়া যান, কিন্তু যাইবার সময় আমার জন্য চারি মাসের ছুটীর ব্যবস্থা করেন। চারিমাসের ছুটী পাইয়া আমি প্রথমে নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা করিতে যাই। আমি পর্যটনে বাহির হইবার পরই যাত্রাপুর কাছারীর নায়েব ধরণীবাবু পরলোক গমন করেন। তৎস্থলে আসেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

১৯২০ সালে গভঃ সেটেলমেণ্ট আরম্ভ হইবে জানিতে পারিয়া যাত্রাপুর কাছারীর কর্তৃপক্ষ সেটেলমেণ্টের পূর্বে ১৯১৮ সালে আমার অনুপস্থিতির সুযোগে গোপালবাড়ীতে আধিপত্য স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে পূজারী বিহারী ব্রজবাসীকে জোরপূর্বক গোপালবাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং তাঁহার স্থলে সীতানাথ চক্রবর্তী নামক পূর্ববঙ্গীয় এক অগ্রদানীয় ব্রাহ্মণের নিকট হইতে—"জমিদারই গোপালবাড়ীর মালেক" এই কথা লেখাইয়া এক নিরূপণ-পত্র (Regd. in Book No. 1. Vol. No. 34. Pages 218-222. Being No. 3737 for 1920.

Signed 6.7.20.) সম্পাদন করাইয়া লইলেন। চক্রবর্তী মহাশয় পূজারীর পদপ্রাপ্ত হইলেন। আমি ছুটীর পর ফিরিয়া দেখিতে পাইলাম—গোপালবাড়ীতে বিহারীপূজারী নাই,—আছেন এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ—নাম সীতানাথ। অনুসন্ধানে সকল কাহিনী জানিতে পারিলাম।

এস.ডি.ও. সুশীলবাবু চলিয়া যাইবার পর গোপেন্দ্রনাথ ঘোষ বাগেরহাটে S.D.O. হইয়া আসেন। বাগেরহাটের স্থানীয় জমিদারগণ ও জনসাধারণের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিগণ গোপেনবাবুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট নালিশ জানাইয়াছিলেন। জনসাধারণের সহিত তাঁহার মিলামিশা না থাকায় কোন জনহিতকার্যে তিনি যোগদান করিতেন না। তজ্জন্য গোপালবাড়ী সম্পর্কে কোন আনুকূল্য করিতে তিনি সম্মত হন নাই। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে গোপালবাড়ীর কাজে কোন সহায়তা পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আমি মাঝে মাঝে গোপালবাড়ীতে গিয়া নবনিযুক্ত সেবাইত সীতানাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত সদ্ভাবস্থাপন করিতে থাকি; তিনিও ওখানে তাঁহার সুবিধা ও অসুবিধার কথা আমাকে বলিতেন। চক্রবর্তী মহাশয় একদিন দুঃখ করিয়া আমাকে বলিলেন—"আমি জমিদারকে ১০০০৲ টাকা ও নায়েবকে ৫০০৲ টাকা নগদ দিয়াছি এবং প্রতিবৎসর ৮১৲ টাকা কর স্বীকার করাইয়া উহারা আমার নিকট হইতে একখানা দলিল লিখাইয়া লইয়াছেন। গোপালবাড়ীর সেবাইত হইলাম, কাজে-কাজেই উহার রথের মেলার মোটা আয় আমারই হইবে।" এই লোভে ও আশায় তিনি এত অর্থব্যয় করিয়া সেবাইতের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোপালসেবার কোন আগ্রহ ও উদ্দেশ্য তাঁহার আদৌ ছিল না। তিনি পূজারীপদে নিযুক্ত হইবার পরেই যে রথযাত্রা উৎসব ও মেলা হইয়াছিল তাহার কোন আয়ই নায়েব সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

তাঁহাকে দেন না। যাহা আয় তাহাই ব্যয়—এইরূপ একটি হিসাবের কাগজ তাঁহাকে দেখান হয় মাত্র।

সীতানাথ চক্রবর্তীকে অপসারণের চেষ্টা

সীতানাথ চক্রবর্তী সদাচারপরায়ণ ছিলেন না। তখন গোপালবাড়ীতে উপযুক্ত বাসঘর না থাকায় তিনি অতিথিশালার নিকটে একখানি চালাঘর বাঁধিয়া তাহাতে বাস করিতেন ও নিজের আহার্য নিজেই রান্না করিয়া খাইতেন। গোপালের সেবাকার্যের জন্য সীতানাথ একজন অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি গোপালের জন্য সামান্য অন্নব্যঞ্জন রান্না করিতেন, তাহা ভোগ লাগাইতেন কিন্তু তাহা শ্রীমদ্ বালকদাস বাবাজীমহারাজের সমাধিস্থানে নিবেদন করিতেন না। সীতানাথ বলিতেন—"বালকদাস বাবাজীর কবরে অন্নাদি লইয়া গেলে তাহা কে খাইবে? উহা ত ফেলিয়া দিতে হইবে।" কাজে-কাজেই বাবাজীমহারাজের উদ্দেশ্যে প্রসাদ উৎসর্গ করা হইত না। সীতানাথের গৃহিণী ঐ চালাঘরে যে মৎস্যাদি রান্না করিতেন তাহা তাঁহারা প্রসাদসহ একত্রেই খাইতেন। সীতানাথের এই অশাস্ত্রীয় ও রীতিনীতি-বিগর্হিত আচারহেতু শুদ্ধভাবে সেবাপরিচালনার জন্য একজন বৈষ্ণবের আবশ্যকতা বিশেষভাবে আমরা অনুভব করিতেছিলাম, কিন্তু জমিদার-কাছারীর সাহায্য ব্যতীত সীতানাথকে অপসারিত করা সম্ভব ছিল না।

১৯২১ সালের জুলাই মাসে জমিদারের নিকট হিন্দু-জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই মর্মে এক আবেদন করা হইল যে, সীতানাথের ন্যায় কদাচারী অবৈষ্ণবদ্বারা গোপালসেবা হইতেছে না এবং হইতেও পারে না, অতএব তাঁহার স্থলে সেবাদক্ষ সদাচারী জনৈক বৈষ্ণবকে নিযুক্ত করা হউক। বাগেরহাটের অন্যতম প্রধান উকীল আশুতোষ বসু মহাশয়ও এই দরখাস্তে সই করিয়াছিলেন।

জমিদারপক্ষ হইতে উক্ত আবেদনের ২৯।৭।২১ তারিখের এক উত্তর আশুবাবুর নিকট পৌঁছিল। উত্তরের মর্ম এই যে,—জনসাধারণ যদি চাঁদা তুলিয়া মন্দির ও নাটমন্দিরাদি ভালভাবে মেরামত করিয়া দেন এবং সেবার জন্য অন্ততঃ কুড়ি হাজার টাকা তুলিয়া জমিদারের হাতে দেন, তবে তিনি পূজারী পরিবর্তন করিতে পারেন,—উত্তরের মধ্যে এরূপ উক্তিও ছিল যে, তিনি একজন বৈষ্ণব,—বৈষ্ণবধর্মে মাছমাংস আহারে ধর্ম যায় ইহা তিনি জানেন না। মালা-তিলকে বৈষ্ণব হয় না, এ-সবের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়াও তিনি মনে করেন না, ইত্যাদি বহু আপত্তিকর কথা লেখা হইয়াছিল।

এই স্থলেই ইহা উল্লেখ করি যে, গোপালবাড়ীতে উপযুক্ত গৃহাদি না থাকায় পূর্ব পূর্ব মোহান্তগণ শ্রীশ্রীগোপালের মূল্যবান অলঙ্কার ও দলিলপত্র নিরাপত্তার জন্য জমিদারের যাত্রাপুরকাছারী বাড়ীতে রাখিয়া দিতেন। ধরণীধর ঘোষ নায়েব থাকাকালে তাঁহার নিকট ঐ সকল জিনিস অনেকবার চাহিয়াও আমরা পাই নাই।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাসের আগমন

বাগেরহাটের জনসাধরণ—বিশেষভাবে স্থানীয় জমিদার-গণের সহিত এস.ডি.ও. গোপেন্দ্রবাবুর আচরণ অত্যন্ত অপ্রিয় হওয়ায় সরকার বিশেষ জনপ্রিয় যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস মহাশয়কে S.D.O.-রূপে বাগেরহাটে প্রেরণ করেন।

এদিকে সীতানাথ চক্রবর্তী রথযাত্রার মেলা হইতে প্রচুর টাকা পাইবার আশা করিয়া বসিয়া আছেন। মেলার অবসানে কাছারীর নায়েব সুরেন ঘোষ মহাশয় সীতানাথকে বলিলেন যে, মেলায় খরচ বাদে মাত্র ১৮৲ টাকা উদ্বৃত্ত আছে। সীতানাথ

তাঁহার এই দুঃখের কাহিনী আমাকে জানাইলেন। আমি তাঁহাকে পরামর্শ দিলাম—একটি লিখিত হিসাব দাবী করিতে। তদনুযায়ী নায়েব মহাশয় তাঁহাকে একটি হিসাব দিলেন। হিসাবের কাগজে ব্যয়ের ঘরে লেখা আছে—(১) Health Officer ভেট ২০০৲ টাকা, (২) পুলিশ ভেট ১৫০৲ টাকা, (৩) S.D.O. ভেট ৫০৲ টাকা ইত্যাদি; উদ্বৃত্ত ১৮৲ টাকা। এই হিসাব পাইয়া সীতানাথ অত্যন্ত বিরক্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। হিসাবটী তিনি আমাকে দিলেন। ইহা নিয়া আমি এস.ডি.ও.-র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"স্যার, আপনি কি গোপালবাড়ীর রথমেলার আয় থেকে ভেট নেন?"

এস.ডি.ও. বলিলেন—"সে কি?"

"এই দেখুন" বলিয়া ওই হিসাবের কাগজখানা তাঁহার হাতে দিলাম। উহা দেখিয়া এস.ডি.ও. উহার উপরই লিখিলেন—"রথের মেলার সময় নায়েব আমাকে ৩।৪টী আনারস দিয়াছিলেন, আমি তৎক্ষণাৎই তার দাম দিয়া দিই। নায়েব গোপালের অর্থ আত্মসাৎ করিতেছেন, এজন্য কেন তিনি ফৌজদারী সোপর্দ হইবেন না তাহার কারণ প্রদর্শন করুন।"

পুনরায় কমিটীকর্ত্তৃক সেবাভারগ্রহণ

এস.ডি.ও. বিশ্বাস মহাশয় আমাকে একদিন বলিলেন—"সুকুমারবাবু-কর্তৃক ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কমিটীতে আপনারা সভ্য আছেন—আপনারা কেন সেবাভার লইতেছেন না? গোপাল-বাড়ীর দায়িত্ব আপনারা লউন, S.D.O. তরফ হতে আমি সর্ব-ভাবে সাহায্য করব।"

বহুদিন যত্নের অভাবে গোপালবাড়ীর বাগানাদি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ায় তদ্দ্বারা সীতানাথের বিশেষ কিছু আয় হয় না। এদিকে ১৯২১ সালের মেলার ১৮৲ টাকার উদ্‌বৃত্ত হিসাব তাঁহাকে

নিরাশ করিয়াছে। গাইগরু, কাঠপাট প্রভৃতি বিক্রয়যোগ্য যাহা গোপালজীউর ছিল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহা বিক্রয় করিয়া উমেশ চক্রবর্ত্তী নামক এক পূজারীকে নিযুক্ত করিয়া এবং তাঁহার উপর গোপালসেবার ভার দিয়া স্বস্থানে (বরিশাল জেলায়) প্রস্থান করিলেন। ১৫দিন পর তাঁহার ফিরিবার কথা, কিন্তু গোপাল-বাড়ীতে তাঁহাকে আর কেহ কখনও দেখে নাই।

আমি পূর্ব্ববৎ ওখানে যাই ও আসি এবং খোঁজখবর লই। এস.ডি.ও. গোপালবাড়ীর সকল সেবাভার আমাদিগকে নিতে বলিলেও আমরা সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলাম। নায়েব সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত আমার সদ্ভাবই ছিল। উমেশ চক্রবর্ত্তী গোপালসেবা চালাইতে অক্ষম হইয়া সেই কথা নায়েব মহাশয়কে বলিলে নায়েব মহাশয় উত্তর দিলেন—"চালাইতে না পার, দরজায় তালা লাগাইয়া দেও।" রথমেলার পর নায়েব গোপালবাড়ীর সেবাদির কোন খোঁজখবর লইতেন না, কারণ তাহাতে সেবাদির দায়িত্ব তাঁহাদিগের বহন করিতে হইতে পারে।

উমেশ চক্রবর্ত্তী আমাকে একদিন বলিলেন—"আমি ৮।১০ মাস মাহিনা পাই না, বাড়ীর সকলে উপবাসী আছে, গোপালসেবা সামান্যভাবেও চালাইতে পারিতেছি না, সীতানাথও আর ফিরিবেন মনে হয় না; এখন আমি কি করি?"

আমি বলিলাম—"আপনি আমার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন;—আপনি গোপালসেবার ভার ও তাঁর সকল জিনিসপত্র আমাদের কমিটীর নিকট হস্তান্তর করুন এবং আমার কথানুযায়ী একটি দলিল করুন; আমি আপনার হাল-বকেয়া সকল পাওনা দিয়া দিব।" যদি ভবিষ্যতে কোন বিপদে না পড়েন তবে তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে রাজী হইলেন। আবার বলিলাম—"যদি স্বয়ং এস.ডি.ও. আপনাকে ওই মর্ম্মে আদেশ দেন তবে কি আপনার ভয়ের বা আপত্তির কোন কারণ

থাকিতে পারে ?” এই কথা শুনিয়া তিনি সম্মত হইলেন। আমি তখন তাঁহাকে নিয়া এস-ডি-ও বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট গেলাম। S.D.O. উমেশ চক্রবর্তীকে বলিলেন—“আপনি গোপালসেবার ভার কমিটীপক্ষে উপেনবাবুর উপর দিয়া দিন, আর গোপালবাড়ীর সকল জিনিসের একটা লিষ্ট করিয়া উপেনবাবুকে বুঝাইয়া দিন, আপনার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।” চক্রবর্তী মহাশয় তাহাই করিলেন।

ইহার পর উমেশ চক্রবর্তী মহাশয় বাড়ী যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া তাঁহার স্থলে অন্য উপযুক্ত লোকের জন্য আমরা চিন্তা করিতে লাগিলাম। অবশেষে বারুইপাড়া নিবাসী যতীন্দ্রনাথ রায় ওরফে জটুদাদার কথা মনে পড়িল। জটুদাদা প্রায় ব্রহ্মচারী ও বাবাজীর ভাবে থাকিতেন। তিনি আমাদের সহিত অনেক নামযজ্ঞে যোগদান করিতেন। একদিন আমি তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। আমি চাকুরী করি; কাজেকাজেই চাকুরীর কাজ ও সময় বজায় রাখিয়া আমাকে এই সকল কাজ করিতে হইত। অতএব দিনের কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া জটুদাদার বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি ১০টা হইল। তাঁহার অগ্রজ মিষ্টিখাবার-ব্যবসায়ী। তিনি আমাকে বলিলেন—“আজ মিষ্টির বায়না আছে বলিয়া আপনার সঙ্গে জটুর যাইতে অসুবিধা আছে।” আমি বলিলাম—“আপনি অন্য লোক নিয়া কাজ তুলুন—তার পারিশ্রমিক আমি দিব।” এইরূপে তাঁহাকে সম্মত করাইয়া ঐদিনই জটুদাকে সঙ্গে নিয়া নৌকাযোগে রাত্রি ২ ঘটিকায় গোপালবাড়ী পৌঁছিলাম। পরদিন সকালেই গোপাল-বাড়ীর সকল জিনিসের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইল। তখন উমেশ চক্রবর্তী দ্বারা এই মর্মে দরখাস্ত লেখান হইল যে, গোপাল-মন্দির কমিটীর অধীনে তিনি কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং বাড়ী যাইবার জন্য ৩ মাসের ছুটী চাহিতেছেন। যতীন্দ্রনাথ রায়ও

(জটুদাদা) এই মর্মে দরখাস্ত লিখিলেন যে, তিনি অস্থায়ীভাবে গোপালসেবা করিতে চাহেন। এস্থলে ইহা বলা প্রয়োজন যে, এস.ডি.ও. সুশীলবাবুর বদলী হওয়ার পূর্বে ধরণী ঘোষ মহাশয়ের স্থলে আমাকে গোপালমন্দির কমিটীর সম্পাদক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কাজেই কমিটীর অনুমোদনসাপেক্ষ আমিই সম্পাদক হিসাবে দরখাস্তে ছুটী মঞ্জুরী লিখিলাম এবং পরে উভয়কে বাগেরহাটে এস.ডি.ও. সমীপে লইয়া গেলাম। তিনি উভয়কেই নির্ভয় ও উৎসাহ দিলেন। আমি এস.ডি.ও.কে জানাইয়া রাখিলাম যে, যতীন্দ্ররায়কে পূজারীর কার্যে অস্থায়ীভাবে রাখিব এবং সুদক্ষ সেবক বিহারীলাল ব্রজবাসীকে আনাইয়া স্থায়ীভাবে রাখার ব্যবস্থা করিব। এদিকে উমেশ চক্রবর্তীকে ১০ মাসের বেতন দিয়া ষ্ট্যাম্পযুক্ত রসিদ লইলাম এবং তাঁহার পরিবারের বস্ত্রাদি খরিদ জন্য তাঁহাকে আরো টাকা দিলাম। শ্রীশ্রীগোপালের জিনিসপত্রের যে তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহাতে কয়েক-জন সাক্ষীরও দস্তখত রাখা হইল। ঠাকুরসেবায় জটুদাদাকে নিযুক্ত করিবার পর আমি একদিন কাছারীর নায়েবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, "সীতানাথ আজিও আসিলেন না, তাঁহার নিযুক্ত চক্রবর্তী মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন ; এজন্য আর একজনকে আনিয়াছি।" কাছারীর কর্মচারিগণ এ-বিষয়ে উদাসীন। ঠাকুর-বাড়ীতে তাঁহারা আদৌ যাইতেনও না, পাছে সেবার দায়িত্বভার স্কন্ধে চাপে। ভালই হইল, এই উদাসীনতা আমাদের (কমিটীর) উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায় হইল।

অতঃপর আমি পূর্বতন পূজারী বিহারী ব্রজবাসীর খোঁজ করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, ব্রজবাসীর ন্যায় একজন শক্ত লোক ব্যতীত জমিদার কর্মচারিগণের বিরুদ্ধাচরণ ও ভীতিপ্রদর্শনে অন্য কাহারো পক্ষে অবিচলিত থাকা দুঃসাধ্য। বিহারী পূজারী একেত বৃন্দাবনের লোক, তাহাতে উদাসীন বৈষ্ণব এবং অনেক

দিন যাবৎ গোপালসেবা করিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পরে জানিতে পারিলাম—তিনি যশোহর জিলার মুরলির আখড়াতে থাকেন।

বিহারী ব্রজবাসীকে আনয়ন

ব্রজবাসীকে আনিবার অভিপ্রায়ে একদিন যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ বসু। তিনি দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহোদর ভ্রাতা; কেবল আই, এ, পাশ করিয়াছিলেন। যখন যশোহর ষ্টেসনে নামিলাম, তখন রাত্রি ৮টা। বর্ষাকাল—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি—ঘোর অন্ধকার—পথ অজানা, ষ্টেসনে কোন যানবাহন নাই। খোঁজ নিয়া জানিলাম —মুরলির আখড়া অনেক দূরে। হউক, যাইতেই হইবে। ষ্টেসন হইতে পদযাত্রা সুরু হইল। পথের দুই ধারে বড় বড় গাছ আমাদের পথের অন্ধকার গাঢ়তর ও ভয়াবহ করিয়া তুলিল; রাস্তার পাশে বাড়ীঘর বিরল। মাঝে মাঝে দূরে যেখানে একটু আলো চোখে পড়ে সেখানে গিয়া আখড়ার খোঁজ লই। অতঃপর শ্রীশ্রীগোপালের কৃপায় ঘণ্টা দুই হাঁটিবার পর আখড়ায় পৌঁছা গেল এবং ব্রজবাসীর দর্শন মিলিল। আখড়াটী একটী বহু পুরাতন মঠ, অসংস্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়ন ও মঠবাসিগণের প্রসাদ পাওয়া হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অসময়ে আমাদিগকে মঠে উপস্থিত দেখিয়া ব্রজবাসী বিস্ময়াবিষ্ট ও বিব্রত হইলেন। আমরা ক্ষুধার্ত বুঝিতে পারিয়া ব্রজবাসী পরদিন সকালে ভৃত্যদের খাবার জন্য যে প্রসাদ রাখিয়াছিলেন তাহা হইতে কিছু অংশ আমাদিগকে দিলেন। আমরা মঠসংলগ্ন পুকুরে মুখহাত ধুইয়া প্রসাদ পাইলাম। ব্রজবাসীর দেখা পাইয়া পথ-শ্রান্তি ভুলিয়া গিয়াছি। তখন লাউপালার শ্রীশ্রীগোপালের সেবাভার গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলাম।

জমিদার কর্মচারীর ভয়ে তিনি প্রথমে সম্মত হইলেন না। বলিলাম —"বাগেরহাটের এস.ডি.ও. ও অন্যান্য বিশিষ্ট সকলে আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, আপনি চলুন, কোনই অসুবিধা হইবে না, অসুবিধা হইলে চলিয়া আসিবেন, যাতায়াত খরচ আমিই দিতেছি।" অনেক আলোচনার পর ব্রজবাসী সম্মত হইলেন, কারণ গোপালবাড়ীতে তিনি পূর্বে বহুদিন ছিলেন বলিয়া গোপালের প্রতি তাঁহার একটা মমত্ববোধ ছিল।

আমাদের রাত্রিবাসের জন্য বিহারী আমাদিগকে একখানা কম্বল ও একটা বালিশ দিলেন; মশারী সঙ্গে নিই নাই, উঁহারাও দিতে পারিলেন না। মশার যেরূপ প্রকোপ দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল, বিনা মশারীতে শয়নে সকাল পর্যন্ত বাঁচিবার সম্ভাবনা কম। শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের সময় বিভিন্নস্থানে রাত্রিযাপনের কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল। সেইটী তখন প্রয়োগ করিলাম; আমাদের দু'জনের পরণের কাপড় দু'খানি খেজুর কাটার সাহায্যে সাময়িক মশারিতে পরিণত হইল এবং তন্মধ্যে কোন প্রকারে রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন সকালেই বিহারী ব্রজবাসীকে সঙ্গে লইয়া বাগেরহাটে যাত্রা করিলাম। বাগেরহাটে পৌছিয়া স্থানীয় উকিল গিরিশচন্দ্র দাস ও আশুতোষ বসু মহাশয়দিগের সহিত ও এস্.ডি.ও. যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের সহিত ব্রজবাসীকে পরিচয় করাইয়া দিলাম। উঁহারা সকলেই ব্রজবাসীকে গোপাল-সেবার কার্যে বিশেষ উৎসাহ দিলেন। ব্রজবাসীকে লাউপালায় নিয়া গোপালসেবার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলাম এবং পূর্ব-বারে গোপালবাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়ার পূর্বের একখানা ছুটীর আবেদন ও এবারে কার্যে যোগদানের জন্য অপর একখানি আবেদন তাঁহার দ্বারা লেখাইয়া লইলাম। জটুদাদাও আপাতত ওখানে থাকিলেন। যাত্রাপুর কাছারীর নায়েব ও কর্মচারীবৃন্দ এই সব ঘটনা জানিতে পারিলেন না।

যাত্রাপুর কাছারীর কর্মচারিগণের ১০০০৲ টাকা করিয়া মুচলেকা

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে বাদুখালিতে প্রজাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগে প্রজারা জমিদারের যাত্রাপুর কাছারীর কর্মচারিগণের বিরুদ্ধে এস.ডি.ও.-র কোর্টে পৃথক পৃথক ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করেন। সেই সব মোকদ্দমায় এস.ডি.ও. জে. কে. বিশ্বাস নায়েব ও ৫।৬ জন কর্মচারী প্রত্যেকের নিকট হইতে একবৎসর সৎভাবে থাকিবার সর্তে ১০০০৲ করিয়া জামিন লয়েন। এইরূপ শাসনে গোপালবাড়ীর কার্যপরিচালন কিছুটা সহজ হইয়াছিল। জে. কে. বিশ্বাস বাগেরহাটে থাকা পর্যন্ত গোপালবাড়ীর কার্যপরিচালনে জমিদারের কর্মচারীরা কোন বাধা সৃষ্টি করিতে সাহস করেন নাই।

ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কমিটীর সভাপতি নির্বাচন

এস.ডি.ও. যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস বলিয়াছিলেন—"আমি খৃষ্টধর্মাবলম্বী বলিয়া গোপাল-কমিটীতে যোগ দিতে পারি না, তবে আপনারা আমাদ্বারা সর্বপ্রকার সাহায্য পাইবেন। আপনারা ঘাটভোগের ত্রৈলোক্যবাবুকে সভাপতিপদে বরণ করুন; তাঁহাকে সম্মত করাইতে আমিও চেষ্টা করিব।" ত্রৈলোক্যবাবুর কথা আমার বিশেষ জানা ছিল। তিনি ছিলেন তেজস্বী, দৃঢ়চেতা, পরহিতব্রতী ও স্বদেশসেবী। দেশহিতকর কার্য করাই ছিল তাঁহার জীবনব্রত। দৌলতপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা কার্যে ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় ত্রৈলোক্যবাবুর ন্যায় উদারচেতা ব্যক্তির আথিক ও কায়িক সাহায্য না পাইলে কলেজকে হয়ত দাঁড় করাইতে পারিতেন না। ১৯১১ সালে সরকার যখন কলেজের জন্য ৭০,০০০৲ (সত্তর)

হাজার টাকা সাহায্য দেন তখন কলেজ পরিচালনের জামিন-স্বরূপ ৫০,০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি জামিন না দিলে সরকার সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন। তখন ত্রৈলোক্যবাবুই কলেজের পক্ষ হইতে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি জামিন দেন। তিনি কলেজের শ্রীশ্রীদধিবামনঠাকুর সেবার নিমিত্ত বহুদিন পর্যন্ত মাসিক সাহায্য দিতেন এবং সর্বদাই কলেজের আর্থিক অনটনে সাহায্য করিতেন।

ত্রৈলোকবাবু খুলনা জেলার প্রসিদ্ধ ঘাটভোগ গ্রামের বিখ্যাত শাক্ত-ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া অতি নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিত বাড়ীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতঃ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা এবং সাধুবৈষ্ণব-সেবা প্রবর্তন করেন। এতদ্দেশে তিনি সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ আরম্ভ করেন। তৎকালে নামযজ্ঞের সহিত জনসাধারণের তেমন পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল না। তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা রক্ষা করিতে গ্রামস্থ সমাজ-প্রবীণদিগের নিকট হইতে তাঁহাকে অনেক বাধা ও লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অসীম দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা কখনো কাহারো নিকট অবনমিত হয় নাই। পরে সত্য ও ধর্মের জয় হইয়াছিল—সকলেই তাঁহার ধর্মানুষ্ঠান ও উৎসবাদির সমর্থন ও আনুকূল্য করিতেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায় মন্ত্রী হইবার পর খুলনায় আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাংলাদেশে তিনি যদি দশজন ত্রৈলোক্য চাটুজ্জ্যে পাইতেন তবে বাংলার আমূল পরিবর্তন ঘটাইতে পারিতেন।

এস.ডি.ও. মহাশয়ের পরামর্শে আমি উক্ত ত্রৈলোক্যবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রস্তাব তাঁহাকে (ত্রৈলোক্যবাবুকে) জ্ঞাপন করিলাম। গোপালবাড়ীর বিশদ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি মন্দির-কমিটীতে যোগদান করিতে এবং কমিটীর সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

সেবা-পরিচালন ও মেরামত ব্যবস্থার নিমিত্ত দ্বিতীয় সাধারণ সভার অধিবেশন

১৯২১ সালের ২৯শে অক্টোবর তৎকালীন মোহান্ত দ্বারিক অধিকারীর সহিত আলোচনা করিয়া খুলনা ও বাগেরহাটের প্রবীণ আইনব্যবসায়িগণের পরামর্শক্রমে গোপালমন্দির-কমিটী পরিচালন মানসে একটি নিয়মাবলীর খসড়া প্রণয়ন করতঃ তাহা অনুমোদন জন্য একটি সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কলিকাতার শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সভাপতি ও শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারক পত্রিকার সম্পাদক সুবিখ্যাত বৈদ্যুতিক চিকিৎসক প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয়কে সভার সভাপতিপদে বরণ করা হয়। সভাতে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে খুলনার সুবিখ্যাত উকীল নগেন্দ্রনাথ সেন, উকীল শরৎচন্দ্র দাস, হিতবাদী পত্রিকার ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, বি-এল, উকীল গিরিশচন্দ্র দাশ, উকীল আশুতোষ বসু, উকীল ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক, উকীল অম্বিকাচরণ বকসী, প্রধানশিক্ষক তারকচন্দ্র দত্তগুপ্ত, শিক্ষক মতিলাল ভৌমিক, মোক্তার ব্রজেন্দ্রলাল সেন, পণ্ডিত বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ, শিক্ষক লোকনাথ দে, কবিরাজ রসিকলাল নাথ, অদ্বৈতচন্দ্র বিশ্বাস, কালিদাস চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, হৃদয়দাস বৈরাগী, রামলাল বৈরাগী, রূপদাস বৈরাগী, হরিনাথ দে, বিশ্বম্ভর বসু, ইন্দুভূষণ ঘোষ, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ রাহা, ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল সুরেন্দ্রনাথ বসু, মোহান্ত দ্বারিকনাথ অধিকারী ও পূজারী বিহারীলাল ব্রজবাসী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সভায় গোপালসেবা কমিটীর নিয়মাবলী মোহান্ত দ্বারিকনাথ অধিকারীর মতানুসারে ও সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হইল। কমিটীর সভাপতি ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। মোহান্তরূপে দ্বারিকনাথ অধিকারী যে সকল অধিকার পরিচালনা করিতেন—উক্ত

নিয়মাবলী অনুমোদন করাইয়া তিনি তাহা কমিটীকে অর্পণ করিলেন। (High Court Appeal Paper Book Pages 59-62.)

জমিদারের নায়েবকর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটী গঠনের প্রচেষ্টা

পুরাতন গোপালসেবা কমিটীকে ক্ষমতাহীন করিবার অভিপ্রায়ে কাছারীর নায়েব সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯২০ সালে কয়েকজন লোকের নাম লইয়া একটী প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটী খাঁড়া করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উক্ত কমিটীর সভাপতি নির্বাচন করা হইয়াছিল। জমিদারপক্ষ ধারণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিজেরা সম্মুখে না আসিয়া জনসাধারণের মধ্য হইতে কয়েকজনের নাম দিয়া একটী কমিটী গঠন করিতে পারিলে পুরাতন কমিটীকে ক্রমশঃ ক্ষমতাচ্যুত করা যাইবে। ত্রৈলোক্যবাবুকে আমাদের কমিটীতে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে গিয়া তাঁহার নিকট নায়েব-গঠিত কমিটীব সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারি এবং তৎপর নায়েব-গঠিত সম্পাদকের নিকট হইতেও সমস্ত কাগজপত্র আমরা প্রাপ্ত হই।

গোপালবাড়ীর সংস্কার আরম্ভ

১৯২২ সালে S.D.O. জে. কে. বিশ্বাস চলিয়া যান এবং হরেন্দ্রনাথ দত্ত S.D.O.-রূপে আগমন করেন। এই সময় আমরা গোপালবাড়ীর মন্দিরের সম্মুখভাগের বৈষ্ণবখণ্ডের ৪ খানা ঘর মেরামত করিতে আরম্ভ করিয়া জানিতে পাইলাম, জমিদারের লোক আসিয়া মেরামতের কার্যে আমাদিগকে বাধা দিবে। ঐ সময় জমিদার সতীপ্রসন্নবাবু স্বয়ং কাছারীতে আছেন জানিয়া উকীল গিরিশচন্দ্র দাশ ও উকীল ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক ও আমি

জমিদার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কাছারীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তিনি গোবরডাঙ্গায় রওনা হইয়াছেন। তখনই আমরা যাত্রাপুর ষ্টেসনে গিয়া তাঁহাকে পাইলাম এবং সংক্ষেপে গোপাল-বাড়ী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম। মন্দিরাদি সংস্কার করিতেছি জানিয়া তাহাতে তিনি খুব উৎসাহই দিলেন এবং তাঁহার কাছারীতে গচ্ছিত শ্রীশ্রীগোপালের স্বর্ণালঙ্কার ও দলিলপত্র সব ফেরৎ দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ওই জমিদার মহাশয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ এই প্রথম।

১৯২২ সালে যখন আমরা প্রথম মন্দিরাদির সংস্কারকার্য আরম্ভ করি তখন ঐ কার্যের জন্য সাধারণের নিকট হইতে কোন সাহায্য লই নাই। আমাদের ধারণা—কার্যারম্ভ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত সাধারণের বিশ্বাস আসে না। তজ্জন্য আমার এক আত্মীয়ের গহনা চাহিয়া লইয়া তাহা বন্ধক রাখিয়া ও কয়েকজন বন্ধুর নিকট হইতে কিছু কিছু হাওলাত করিয়া গোপালবাড়ীর সংস্কারকার্য আরম্ভ করিলাম। কাজ আরম্ভ করিতেই কাছারী হইতে লোকজন আসিয়া কাজে বাধা দিয়া বলিল—"এটী জমিদারের ঠাকুরবাড়ী, আপনারা কোন্ অধিকারে ইহার মেরামতে হাত দিলেন? জমিদারের অনুমতি ছাড়া এসব কাজ করা চলিবে না।"

এইরূপে বাধা পাইয়া আমরা বাগেরহাট ফৌজদারী আদালতে কাছারীর নায়েব ও তাঁহার লোকজনের নামে ১৪৪ ধারার মোকদ্দমা দায়ের করিলাম। মোকদ্দমা ১০৭ ধারামতেই বিচার হয়। এই মোকদ্দমায় আমরা গোপালমন্দিরের সাধারণ সভার অধিবেশনে কলিকাতার যে ডাঃ পি. এন. নন্দী সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাকে ও সেই সভায় যোগদানকারী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাক্ষীতালিকাভুক্ত করিয়াছিলাম। মোকদ্দমা পরিচালনে বাগেরহাটের অভিজ্ঞ আইনজীবিগণের সাহায্যের জন্য

খুলনার খ্যাতনামা উকীল ভুবনচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়কে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

এই সময় কাছারীর কয়েকজন লোক বাদুখালি রঘুনাথপুর গ্রামের এক প্রজার প্রতি অন্যায় উৎপীড়ন করায় বাগেরহাটের মহকুমা-শাসক কাছারীর নায়েব ও কয়েকজন কর্মচারীকে এক বৎসর সদ্ভাবে থাকার জন্য ১০০০৲ টাকার জামিন লইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় আমাদের মোকদ্দমায় তাহাদের খুব অসুবিধা হইবে বুঝিতে পারিয়া তাহারা কোর্টে এই মর্মে এক প্রতিশ্রুতি-দরখাস্ত দিলেন যে, তাহাদের জমিদার গোপালবাড়ী লইয়া স্বত্ব-সাব্যস্তের মোকদ্দমা দায়ের করিতে উদ্যোগী হইতেছেন এবং সেই মোকদ্দমার বিচার না হওয়া পর্যন্ত উহারা গোপালবাড়ীতে যাইবেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মহকুমা হাকিম নায়েব ও তাঁহার লোকজনের নিকট হইতে ৪০০৲ টাকা হিসাবে জামিন মুচলেকা লয়েন। ঐ মোকদ্দমায় (Case No. M/66 of 1922) S.D.O. হরেন্দ্রনাথ দত্ত ১.৬.২২ তারিখে রায়ে লিখিয়াছিলেন—"I see no reason to interfere with the work of repair."

গোপালবাড়ীর জমিজমার দলিল সংগ্রহ

পূর্বেই লিখিয়াছি শ্রীশ্রীগোপালবাড়ীর জমিজমা সম্পর্কীয় সমস্ত দলিলপত্র জমিদারের যাত্রাপুর কাছারীতে ছিল। প্রয়োজনের সময় সেই সব চাহিয়া এবং পাইবার আশ্বাস পাইয়াও কখনো তাহা পাই নাই। ভাবিতে হইল,—জমিদার যদি স্বত্বের মোকদ্দমা দায়ের করেন তবে দলিলপত্র অবশ্য পাওয়া দরকার। চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলাম—রেজেষ্ট্রী অফিসে পুরাণ সূচী (Index) খুঁজিতে পারিলে মূল দলিলগুলির সন্ধান মিলিবে। কিন্তু উপায়? যাঁর কাজ তিনিই পথের ইঙ্গিত দিলেন। কাড়াপাড়ার শচীনাথ গুহ তখন বাগেরহাটের সাব্‌রেজিষ্ট্রার। তাঁহাকে

সকল অবস্থা জানাইলাম। তিনি যথাসম্ভব সাহায্য করিতে চাহিলেন। তাঁহার হেডক্লার্ক আমার সহপাঠী গিরিন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে তিনি বলিয়া দিলেন। আমি অফিসে গিয়া প্রতিদিন সকালে গিরিণবাবুর সাক্ষাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ইনডেক্স বই দেখিতে লাগিলাম। এইরূপ ৫।৬ মাস যাবৎ প্রত্যহ ঐ বই দেখিতে দেখিতে প্রায় ৭০।৭৫ বৎসরের সূচী দেখিলাম এবং আমার খাতায় মোহান্ত কৃষ্ণদাস বাবাজী, গোবিন্দদাস বাবাজী, সখিচরণ দাস বাবাজী ও দ্বারিকানাথ অধিকারীর নামে ও দ্বারা যত দলিল রেজেষ্ট্রী হইয়াছে তাহার নম্বর, তারিখ প্রভৃতি লিখিয়া লইলাম। পরে ঐ সকল দলিলের সইমোহরী (Certified) নকল লইলাম। পরবর্তীকালে উহার অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমাদিগকে প্রচুর সাহায্য দান করিয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবকদিগকে আশ্রয়দান ও আশ্রমারম্ভ

বাগেরহাট মহাকুমার অন্তর্গত বাওইডাঙ্গার প্রখ্যাত চক্রবর্তী পরিবারের কলিকাতা হাইকোটের স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী—ব্রজলাল শাস্ত্রী আমাকে বলিয়াছিলেন—“ভায়া, তুমি গোপাল-বাড়ীর দখল ঠিক রাখিয়া যাও, পরে মোকদ্দমা বিষয়ে আবশ্যক হইলে আমি সাহায্য করিব।” এই সময় ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী দেশে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছেন। কংগ্রেস-কর্মীরা হস্তচালিত তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠা করার জন্য গোপালবাড়ীতে স্থান চাহিলেন। আমি যেমন কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট, তেমনি কর্মীরাও আমার পরিচিত ও বন্ধু। শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ ও জমিদারের সহিত বিরোধ—এই উভয়দিকে অনুকূল মনে করিয়া কর্মীদের প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। গোপালবাড়ীর সামনের দিকে খানিকটা জমি পড়িয়াছিল, তাহা উহাদিগকে ব্যবহার করিতে দিলাম। তাঁহারা সেখানে ঘর তুলিয়া ৭।৮ খানা তাঁত

বসাইলেন, পার্শ্বেই তাঁহাদের বাসগৃহও প্রস্তুত হইল। উদ্যমশীল কর্মীগণের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ আইচ, হরিশচন্দ্র বিষ্ণু, রমাপ্রসাদ নাগ চৌধুরী, রমানাথ রায়, অঘোরচন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উহারা তাঁত ছাড়া বেত দ্বারা বিবিধ জিনিস তৈরী করিতেও লাগিলেন। উহাদের মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন তাঁহারা গোপাল-বাড়ীতেই প্রসাদ পাইতেন। বাল্যকাল হইতে আমার মনে আশ্রমজীবনের আদর্শ জাগ্রত ছিল। দেশের আবহাওয়ার সুযোগে আমি গোপালবাড়ীতে আশ্রম স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিলাম। আশ্রমের বীজ রোপণ করিলাম সংস্কৃত চতুষ্পাঠীদ্বারা। প্রথম অধ্যাপক হইলেন ব্রহ্মচারী মতিলাল ভৌমিক, বি-এ, ছাত্র কাশীশ্বর মিত্র, গিরিন্দ্রনাথ দেব, ননীগোপাল বিশ্বাস প্রভৃতি। ইতিমধ্যে বৈষ্ণবখণ্ডের ৪ খানি ঘর মেরামত হইয়া গিয়াছিল, তাহাতেই অধ্যাপক ও ছাত্রদের বাসস্থানের সুবিধা হইল।

১৯২১ সালের রথের মেলা

গোপালমন্দির কমিটীর পক্ষে আমরা প্রথম ১৯২১ সালের রথের মেলা পরিচালন করি। এই উপলক্ষে মুদ্রিত পত্রদ্বারা দূরের ও নিকটের ৩।৪ হাজার লোককে আমন্ত্রণ জানাই ও মেলার জন্য প্রচারপত্র বিলি করি। কমিটীর সভাপতি ত্রৈলোক্যবাবু পুত্র জ্যোতিশবাবুসহ রথযাত্রার ৫।৬ দিন পূর্বেই আসিলেন। গোপাল-বাড়ীতে বাসঘরের অভাব, তাই পার্শ্ববর্তী হরিদাস বৈরাগীর বাড়ীতেই তাঁহাদিগকে থাকিতে দিলাম। ধনে-মানে-কুলে অভিজাত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সপুত্র বিনা আপত্তিতে স্বচ্ছন্দ মনে তথায় থাকিলেন, আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে ঐস্থানে রাত্রি-যাপন করিতে লাগিলাম। উঁহাদের খাদ্যদ্রব্য সবই উঁহারা নিজ বাড়ী হইতে আনিয়াছিলেন। মেলার শান্তি রক্ষার জন্য বাগের-

হাটের এস.ডি.ও. ৮ জন বন্দুকধারী পুলিশ ১৫ দিনের জন্য মোতায়েন করিলেন। থানা-অফিসার তেজস্বী বিনয় বর্মণ মহাশয়ও নিজে মেলায় উপস্থিত থাকিতেন। তিনি পুলিশদিগকে বলিয়াছিলেন—"গোপালের রথের মেলায় অসদুপায়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিলে হিন্দুর কাছে তাহা গোমাংস এবং মুসলমানের কাছে হারাম।" জমিদার কাছারীর লোকজন নানা উপায়ে মেলার বাধা সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইলেও বিনয়বাবুর কঠোর দৃষ্টিতে তাহারা বিফলমনোরথ হয়। মেলার দোকানপাট সব ত্রৈলোক্যবাবুর পূর্বরচিত পরিকল্পনামত বসান হইল। দূরদূরান্তর হইতে আগত যাত্রীদিগকে প্রসাদ দিবার ব্যবস্থা হইল। প্রতিদিন প্রায় ২।৩ হাজার যাত্রী প্রসাদ পাইতেন। ৮ দিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিল। বহুদিন পূর্ব হইতে নামযজ্ঞ উপলক্ষে বহু গ্রামের বহু লোকের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। ঐরূপ পরিচিত লোক অনেকে এই প্রসাদবিতরণ-যজ্ঞের সহায়তা করিয়াছিলেন—কেহ ভোগের দ্রব্যদ্বারা, কেহ শ্রমদ্বারা। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ৩০।৪০ জন মেলার সময় ওখানে থাকিয়া শান্তিরক্ষা ও অন্যান্য কার্যে সহায়তা করিতেন; তাঁহারা সকলেও গোপালের প্রসাদ পাইতেন। এবারের মেলা বেশ শুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইল, আয়ও হইল প্রায় ৩৫০০৲ টাকা, অতিরিক্ত ব্যয় হেতু বিশেষ কিছু উদ্বৃত্ত রহিল না; কিন্তু যাত্রীদিগের প্রতি যত্ন লওয়া ও অন্নপ্রসাদ বিতরণ জন্য গোপালবাড়ীর প্রতি এবং কমিটীর প্রতি সকলেরই একটা বিশ্বাস ও সহানুভূতি জন্মিল।

পাঠাগার স্থাপন

শ্রীশ্রীগোপালবাড়ীতে একটি পাঠাগার স্থাপনের ইচ্ছা আমাদের অনেক দিনের। এবার আমার বাড়ী হইতে ২টী আলমারী, ৩ খানি চেয়ার ও ১টি টেবিলসহ ৫।৬ শত টাকা

মূল্যের নিজের ধর্মগ্রন্থগুলি লইয়া আসিলাম। কোন কোন বন্ধু আমাকে বলিলেন যে, জমিদার স্বত্বের মোকদ্দমা করিতেছেন, তোমরা হারিয়া গেলে ঐসব জিনিস আর ফেরৎ পাইবে না। উত্তর দিলাম—গোপালের যদি তাহাই ইচ্ছা হয়,—হউক। এই সময় হইতে যে সব স্থানে নামযজ্ঞ হইত, সেই সব স্থানে গোপালবাড়ী ও ঠাকুরসেবার কথা প্রচার করিতে ও কিছু কিছু ভিক্ষা গ্রহণ আমরা করিতে আরম্ভ করি।

অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন লাউপালাগ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন 'বৈরাগী' সম্প্রদায়ভুক্ত, ভিক্ষা তাহাদের বৃত্তি। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ভিক্ষা করিত, বালক-বালিকারা বাল্যকাল হইতেই ভিক্ষা আরম্ভ করিত। গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষার আলোকদান ও নৈতিক মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়া দিলাম। যাহারা বই-শ্লেট কিনিতে পারিত না তাহাদিগকে তাহাও কিনিয়া দিতাম। গ্রামবাসিগণের মধ্যে সৎ-নীতি প্রবর্তন করিতে না পারিলে ঠাকুরসেবা ও আশ্রমপ্রতিষ্ঠা অর্থহীন হয়। তন্নিমিত্ত সংযত জীবন যাপনের জন্য চাপ দেওয়াতে কয়েক ঘর বৈরাগী লাউপালাগ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছিল। বিদ্যালয়ে একজন ম্যাট্রিকপাশ শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন; আহার ও বাসস্থান ছাড়া তাঁহাকে মাসিক ২৫৲ টাকা দিতাম। ক্রমে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বৃষ্টি না হইলে বিদ্যালয় বৃক্ষতলেই বসিত। স্কুল ভালভাবেই চলিতেছে—স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর পরিদর্শনে আসিলেন। আশ্রম ও বিদ্যালয় দর্শন করিয়া তিনি একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিতেও পরামর্শ দিয়া গেলেন। নৈশ-বিদ্যালয় বসিল। নিরক্ষর ভিক্ষোপজীবিগণ ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গ্রামের শিক্ষাদীক্ষাহীন কয়েকজনও তাহাতে যোগদান করিলেন।

সরকারী কর্তৃপক্ষ তাহাতে মাসিক সাহায্যও মঞ্জুর করিলেন। বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতিতে আমরা সন্তোষ লাভ করিলাম।

জমিদারের সহিত নিষ্পত্তির চেষ্টা

১৯২২ সালে গোপালবাড়ী লইয়া রাংদিয়া পরগণার জমিদার গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সহিত আমাদের ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতেছিল। এই সময় বাগেরহাটের এস.ডি.ও. আমাদিগকে বলিলেন—"আপনারা জমিদারের সহিত দেখা করিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলুন, হয়তঃ তাঁহারা একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছেন। সাক্ষাৎ আলাপে আপোষে মীমাংসা হইতে পারে।" তাঁহার পরামর্শানুযায়ী জমিদারের উকীল আশুতোষ বসু, নায়েব সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, গোপাল-কমিটির সভাপতি ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, কমিটীর সভ্য গিরিশচন্দ্র দাস ও আমি গোবরডাঙ্গায় গেলাম। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র দত্তের ভগ্নীপতির বাড়ী ছিল গোবরডাঙ্গায়, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে সঙ্গে নিলাম। আমরা গোবরডাঙ্গায় যাইয়া প্রফুল্লবাবুর ভগ্নীপতির বাড়ীতে উঠিলাম, আশুবাবু ও সুরেনবাবু জমিদার-বাড়ীতে উঠিলেন। গোবরডাঙ্গা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ত্রৈলোক্যবাবুর আত্মীয়, ত্রৈলোক্যবাবু তাঁহার বাড়ীতে গেলেন। জমিদারপুত্র সতীপ্রসন্নবাবু ওই শিক্ষক মহাশয়ের ছাত্র। শিক্ষক মহাশয় আমাদিগকে বলিলেন—"অধুনা জমিদারদের যেরূপ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি তাহাতে কোন সুফল আশা করা যায় না, তবু আপনারা এতদূরে আসিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।" প্রথমতঃ আমরা বৃদ্ধ জমিদার অন্নদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন—"জমিদারীর কাজকর্ম ছেলেদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছি, আপনারা সতীপ্রসন্নের সহিত কথাবার্তা বলুন।" সতীবাবুর বৈঠকখানা দোতালায়;

সেখানে ৪।৫ খানা চেয়ার ও একখানা টেবিল ছিল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় কথা আরম্ভ করিলেন; বলিলেন—"আমি তোমাদের তিন পুরুষ দেখ্‌ছি। তোমার ঠাকুরদাদার আমলে দেখেছি,—তিনি ছিলেন গ্রামের অভিভাবক। বড় বটগাছতলায় তাঁর বৈঠকখানা ছিল, সেখানে বড় বড় শপ্‌ ও সতরঞ্চ পাতা হ'ত, সকল জাতির জন্য ৮।১০টী ডাবা-হুকা থাকৃত। গ্রামের সকল শ্রেণীর লোক সেখানে সমবেত হ'তেন। গ্রামের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সকলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা ক'রতেন এবং তিনিও সকলের সকল কথা মন দিয়ে শুনে যথাযথ ব্যবস্থা ক'রতেন বা পরামর্শ দিতেন। তাঁর এই গাছতলার বৈঠকখানাই ছিল সকলশ্রেণীর লোকের মিলনক্ষেত্র। তারপর দেখলাম তোমার পিতাকে। তিনি নীচতলার বড় একটী হল্‌ঘরে তক্তপোষের উপর ফরাস ও তাকিয়া দ্বারা বৈঠকখানা সাজাতেন। সেই বৈঠকখানায় পূর্বের মত সব লোক আসতেন না, আসতেন পদস্থ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মাত্র। এখন তোমরা আরও মার্জিত ভাবসম্পন্ন। বৈঠকখানা দোতালায়, তাহাতে চেয়ার ও টেবিল। তাই গ্রামের সঙ্গে তোমাদের পূর্ব-যোগাযোগ যেন ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এবং সাধারণের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝবার শক্তিও তোমাদের লোপ পাচ্ছে। দেখ, এই ভদ্রলোকেরা জনসাধারণের পক্ষ হ'তে তোমার কাছে এসেছেন, ধৈর্য ধরে ওঁদের কথা শোন, দেখ যদি কিছু সুব্যবস্থা ক'রে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'তে পার।" প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কথা শেষ হইলে আমরা বলিলাম—"লাউপালার গোপালবাড়ীর ন্যায় ঠাকুরবাড়ী আপনাদের জমিদারীর অন্তর্গত,—ইহা আপনাদের গৌরবের বিষয়; কিন্তু মেরামতের অভাবে ঘরবাড়ীর এবং যথাযোগ্য তত্ত্বাবধানের অভাবে শ্রীবিগ্রহসেবার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে; এইক্ষণ স্থানীয় হিন্দু-জনসাধারণ যদি ঘরবাড়ীর সংস্কার ও সেবাদির শৃঙ্খলাবিধান করিতে পারে

তবে আপনাদের জমিদারীর একটা প্রধান কীর্তি রক্ষিত হইতে পারে। কিছুদিন পূর্বে যাত্রাপুর রেলষ্টেশনে আপনাকে এই সকল কথা বলিয়াছিলাম এবং আপনিও গোপালবাড়ীর সংস্কার করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং গচ্ছিত স্বর্ণালঙ্কার ও দলিলপত্র সব ফেরৎ দিতে আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা সংস্কারকার্য আরম্ভ করিতেই কাছারী হইতে আমাদিগকে বাধাদান ও ভয় প্রদর্শন করা হয়। এমতাবস্থায় আমরা ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হই।" ইহা ছাড়াও অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে S.D.O.-ও বিশেষ খোঁজখবর লইতেছেন শুনিয়া সতীবাবু উত্তর করিলেন, "S.D.O. কি করিতে পারে? তেলাপোকাও পাখী, আর মফঃস্বলের S.D.O.-ও হাকিম!" এই জাতীয় বিদ্রূপাত্মক উত্তর দিয়া তিনি বলিলেন যে, যদি কমিটী করিতেই হয় তবে তাহার এক-চতুর্থাংশ সভ্য জনসাধারণ নির্বাচন করিবে, আর তিনি নির্বাচন করিবেন তিন-চতুর্থাংশ। তদুত্তরে ত্রৈলোক্যবাবু বলিলেন, —জমিদারের উপর জনসাধারণের কোন আস্থা নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া জমিদারের কর্মচারীরা যে ভাবে রথমেলা ও ঠাকুর-সেবা পরিচালনা করিতেছেন, আর কিছুকাল যাবৎ এরূপ চলিলে সকলই বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা।

জমিদারবাবুদের সহিত সাক্ষাৎ ব্যর্থ হইল। সেখানে কিছু জলযোগ করিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। তাঁহাদের বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় আসিলে তাঁহাদের অন্য শরিক ৺গিরিজা-প্রসন্নবাবুর পুত্রগণ আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ইতিপূর্বে একবার ইঁহাদের জমিদারীর অন্তর্গত রামপাল থানার মদনাখালিতে শ্রীশ্রীগোপালজীউর জমি সম্পর্কে ইঁহাদের উকীল শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে নিয়া মধুদিয়া কাছারীতে দেখা করিয়াছিলাম। সেবারে তাঁহাদের সৌজন্যপূর্ণ আলাপ-ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিয়া-

ছিলাম। গোবরডাঙ্গায় এবারে ইঁহাদের বাড়ীতে দেখা করার সুযোগে গোপালবাড়ীর আনুপূর্বিক সকল বিষয় ও সতীপ্রসন্নবাবুর নিকট আমাদের প্রস্তাব ও তাহাতে তাঁহার উত্তর প্রভৃতি বিষয় উত্থাপন করিলাম। তাঁহারাও সকল কথা শুনিয়া তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিলেন।

৺গিরিজাপ্রসন্নবাবুদের মধুদিয়া পরগণার জমিদারীর মধ্যে শ্রীশ্রীগোপালজীউর কিছু কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। গিরিজা-বাবুর পুত্রেরা বলিলেন—"আমাদের মধুদিয়া পরগণায় গোপালের কিছু কিছু দেবোত্তর আছে। সাধারণের পক্ষ হইতে গোপাল-কমিটী যদি সেবাদির ভার গ্রহণ করেন তবে ঐ দেবোত্তর সম্পত্তির আয় যাহাতে গোপাল-কমিটী পান তাহার ব্যবস্থা আমরা করিব। আপনারা গোপালবাড়ীর মেরামত ও সেবাদির উন্নতির চেষ্টা করুন; তাহাতে সতীপ্রসন্ন কোন প্রতিকূলতা করিলে আমরা মধুদিয়া কাছারীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে লিখিব যাহাতে তিনি আপনাদিগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।" এই সময় রাখালগাছির হরপ্রসাদ নাগচৌধুরী ছিলেন মধুদিয়া কাছারীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও বলিষ্ঠদেহী হরপ্রসাদবাবুর চরিত্রের দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। জমিদারবাবুরা আমাদিগকে তথায় রাত্রি যাপন করিতে বিশেষ যত্ন করিলেন, কিন্তু আমরা সেইদিনই সন্ধ্যার ট্রেনে খুলনায় ফিরিয়া আসিলাম। S.D.O. হরেনবাবুর পরামর্শমতই আমরা জমিদারদিগের সহিত দেখা করিতে গিয়া-ছিলাম; ফিরিয়া তাঁহাকে সকল বিষয় বলিলে তিনি বলিলেন, "তবে আর উপায় কি! মোকদ্দমা চালাইয়া যাউন।"

দেবোত্তর খাসমহলের নামপত্তন

বাগদীয়া চরে শ্রীশ্রীগোপালের যে কয়েক বিঘা ধানীজমি মন্দিরের মোহান্ত দ্বারিকানাথ অধিকারীর নামে ছিল তাহা

কমিটীর সম্পাদকের নামে নামপত্তন করিবার জন্য আবেদন করিলে S.D.O. J. K. Biswas তাহা তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার ভার কানুনগোবাবুর উপর অর্পণ করেন। "কমিটীই বর্তমানে শ্রীশ্রীগোপালের সেবাইত এবং কমিটীর নামেই নামপত্তন হওয়া উচিত" বলিয়া কানুনগো রিপোর্ট দেন। ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে S.D.O. নামপত্তন মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীগোপালের অন্যান্য যাবতীয় সম্পত্তি শেষ মোহান্ত দ্বারিকানাথ অধিকারীর নামেই ছিল; তাহার কারণ, সরকারের নিকট তিনিই সেস্-রিটার্ণ দেন। সকল সম্পত্তির সন্ধান পাইবার জন্য আমরা ঐ সেস্-রিটার্ণের সইমোহরী নকল লইয়াছিলাম। (High Court Paper Book Pages 42-47) ১৯২১ সালে সেস্-রিটার্ণ দেওয়ার পূর্বে কমিটীর সম্পাদক হিসাবে আমার নামপত্তন জন্য কালেক্টরীতে আবেদন করি। সেই আবেদনে দ্বারিক অধিকারী সম্মতিসূচক দস্তখত দেন। আবেদন মঞ্জুর হয়। তদবধি কমিটীই সকল দেবোত্তর সম্পত্তির সেস্-রিটার্ণ দাখিল করিতে থাকেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী মেলা মিলাইবার প্রয়াস

শ্রীশ্রীগোপালসেবার প্রধান আর্থিক অবলম্বন রথের মেলার আয়। সেই আয়ের পথ কমিটীর আয়ত্তের বাহিরে রাখিতে পারিলে কমিটীর কর্তৃত্ব খর্ব ও লোপ করা যায় এই উদ্দেশ্যে লাউপালার অপর পারে জমিদারের কাছারীর সম্মুখে রথের মেলা বসাইবার জন্য জমিদারপক্ষ উদ্যোগী হইলেন। রথযাত্রা পর্বের একমাস পূর্বে সতীপ্রসন্নবাবু সদলে যাত্রাপুর কাছারীতে আগমন করিলেন এবং জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া বলিলেন যে, তিনি যাত্রাপুরে একটী শিল্পপ্রদর্শনী খুলিবেন তাঁহাকে তাহা উদ্বোধন করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সম্মতি দিলেন। মেলার জন্য মুদ্রিত বিজ্ঞাপন বিলি হইতে লাগিল, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ষ্টার থিয়েটার

বায়না হইল, তজ্জন্য কাছারীবাড়ীর সামনে মঞ্চাদি তৈরি হইতে লাগিল, ছোট ছোট ঘর তৈরী হইল, তাহাতে দোকান ও জুয়াড়ী আসিতে লাগিল। সতীবাবু ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মতি পাইয়াছেন, কাজেকাজেই মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে ঐ বিষয়ে দেখা করেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি—সতীবাবু মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে গ্রাহ্যই করেন না। আমরা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট হরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া সতীবাবুর মেলার আয়োজনাদির বিষয় জানাইলাম।

তাঁহাকে বলিলাম, "স্মরণাতীত কাল হইতে লাউপালার গোপালজীউর রথের মেলা গোপালজীউ-মন্দিরের সংলগ্ন নির্দিষ্ট মাঠে বসিয়া আসিতেছে। এবারও রথযাত্রা উপলক্ষ্যে লাউপালা মাঠে মেলা বসিতেছে এবং বসিবেই; এইক্ষণ একই সময়ে লাউপালার অপর পারে আর একটি মেলা বসিলে দোকানপাট লইয়া ক্রেতাবিক্রেতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঙ্গাহাঙ্গামা ও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা।" আমার বক্তব্য শুনিয়া সেই মর্মে তিনি আমাকে একটা দরখাস্ত করিতে বলিলেন এবং D.S.P.-কে ডাকিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করিলেন। আমরা দরখাস্ত দাখিল করিলাম। তাহাতে তিনি বাগেরহাটের থানা অফিসারের উপর তদন্ত ও রিপোর্ট দিবার আদেশ দিলেন। থানা অফিসার ঘটনাস্থলে গিয়া দেখিয়া বুঝিয়া D.S.P.-র মাধ্যমে S.D.O.-র কাছে রিপোর্ট দিলেন। থানা অফিসার তাঁর রিপোর্টে নূতন-মেলার আয়োজন বন্ধ করিবার অভিমত দিলেন। তদ্দৃষ্টে S.D.O. সতীপ্রসন্নবাবু ও তাঁহার সহকারী ১২।১৪ জনের নামে ১৪৪ ধারা জারি করিলেন এবং পুলিশকে আদেশ দিলেন—আরব্ধ গৃহাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে। S.D.O.-র আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য জমিদারপক্ষ urgent fee দিয়া S.D.O.-র order-এর নকলজন্য দরখাস্ত করিলেন। আমি খুলনার প্রবীণ উকীল নগেন্দ্রনাথ সেন ও

শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়গণের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিলাম। নগেনবাবু খুলনার খ্যাতনামা উকীল ও মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন, "তুমি লাউপালার গোপালবাড়ীর বিষয়টী উপেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়া যাত্রাপুরের জমিদারপক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেটকোর্টে আপীল দায়েরের পূর্বে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিও।" কুঞ্জবাবু সব শুনিয়া লিখিয়া লইলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের খাসকামরায় গিয়া প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহাকে জানাইলেন—"লাউপালার মেলা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই মেলায় খুলনা যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলা হইতে বহু হিন্দু দর্শনার্থী ও পণ্যব্যবসায়ী আসিয়া থাকেন। বাগেরহাটের S.D.O. ১৯১৫ সালে হিন্দু জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকব্যক্তিকে লইয়া তৎকালীন মোহান্তের অনুমোদনক্রমে একটী মন্দির পরিচালক কমিটী গঠন করিয়াছেন; এবং তদবধি ঐ কমিটিই গোপালসেবার কার্য চালাইয়া আসিতেছেন। জমিদারপক্ষ চাহেন গোপালের আয় আত্মসাৎ করিতে এবং সেবাদির দায়িত্ব এড়াইতে। এই উদ্দেশ্যেই কমিটীকে বিপদাপন্ন করিবার চেষ্টাই জমিদার করিতেছেন—শিল্পপ্রদর্শনী একটা ভাওতামাত্র। মন্দির ও সেবার উপর জমিদারী-আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারিয়া আক্রোশ ও ঈর্ষাবশতঃ মেলা ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী মেলা খাড়া করার চেষ্টা জমিদার করিতেছেন।" কুঞ্জ-বাবুর বিবৃতিতে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করিলেন, "I am the last person to encourage the so called exhibition. I could not previously understand the matter inside..." (Case No. M. 101 of 1922, U/S. 144)

জমিদার ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আপিল দাখিল করিলেন। শুনানীর দিন ধার্য হইল। আমাদের পক্ষে উক্ত কুঞ্জবাবু,

শরৎচন্দ্র দাস ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়চৌধুরী—এই তিনজন উকীল উপস্থিত হইলেন। বিচারক স্বয়ং জেল'-ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের উকীলবাবুদের সওয়াল শুনিয়া, পুলিশের রিপোর্ট, তাহাতে D.S.P.-র মন্তব্য, S.D.O.-র রায় ও হুকুম দেখিয়া S.D.O.-র ১৪৪ ধারার আদেশ বহাল রাখিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে জমিদার কলিকাতা হাইকোর্টে আপিল করিলেন। গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা বুঝিয়া হাইকোর্ট আপিল ডিস্‌মিস্‌ করিলেন। জমিদারের শিল্পমেলা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল।

জমিদারকর্তৃক স্বত্বের মোকদ্দমা

গোপালজীউর রথের মেলা নষ্ট করার প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় জমিদারপক্ষ স্বত্বসাব্যস্ত জন্য এক মোকদ্দমা বাগেরহাট দ্বিতীয় মুনসেফী আদালতে দাখিল করিলেন (Title Suit No. 391 of 1922). মোকদ্দমাটী শুধু রথমেলার জন্য, কেননা, ইহা একটী পরীক্ষামূলক মোকদ্দমা (test suit) মাত্র। আমরা মোকদ্দমায় বিবাদীর সমন পাইয়া উহার জবাব দিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বাগেরহাট কোর্টের খ্যাতনামা উকীল—শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ বসু ও কিরণচন্দ্র নাগ প্রত্যেকে পৃথক এক একটী জবাবের মুসাবিদা করিয়া দিলেন। ওই জবাবগুলি খুলনার প্রসিদ্ধ উকীল নগেন্দ্রনাথ সেন, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র দাস ও বসন্ত কুমার হালদার মহাশয়গণকে দেখাইলাম। তাঁহারাও পৃথকভাবে ৩টী জবাব লিখিলেন। ওই জবাব তিনটী কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকীল ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখাইলে তিনিও একটা জবাবের মুসাবিদা করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত জবাবেই কোর্টে দাখিল করিলাম। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত বিশিষ্ট উকীলগণের কেহই কোন ফি গ্রহণ করেন নাই।

অপ্রত্যাশিত দানপ্রাপ্তি

শ্রীশ্রীগোপালজীউর সেবা ও বৈষয়িক কাজকর্ম সর্বদাই আর্থিক অনটনের মধ্যে চলিত। তদুপরি জমিদারপক্ষ ক্রমাগত মামলা করার জন্য আর্থিক অভাব গুরুতর হইয়া উঠিল। একদিন বিকাল বেলায় গোপালবাড়ীতে বসিয়া আছি, এমন সময় মোহান্তজী বলিলেন, "বর্তমানে গোপালের খুব আর্থিক সঙ্কট, নয় কি, উপেনবাবু? তবে আপনি যদি নিঃস্বার্থভাবে এইরূপে গোপালের সেবা চালাইয়া যান তবে গোপাল কি অর্থের ব্যবস্থা করিবেন না? তাঁহার ইচ্ছায় কি না হয়?" ঠিক এই কথার পরেই খদ্দর-পরিহিত এক সুদর্শন যুবক গোপালবাড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'আপনি কি উপেনবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি আমাকে চিনেন কি?'

'আপনাকে কোথায় দেখিয়াছি মনে হয়, তবে ঠিক মনে হচ্ছে না।'

'আমার নাম সুবোধচন্দ্র দে, বাড়ী ডিংসাইপাড়া।'

সুবোধবাবুর নাম তখন দেশে খুব প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাঁহার গ্রামে তিনি নানা জনহিতকর কার্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে নির্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন। আমি বলিলাম, "আপনার নাম আমার বিশেষ পরিচিত, আজ সাক্ষাৎ পাইয়া প্রীত হইলাম।" তিনি বলিলেন, "আপনি এই অঞ্চলের অনেক লোকের নিকট আপনার নাম শুনিয়াছি, আজ দেখা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।" আমি গোপালবাড়ীর পূর্বের ইতিহাস ও তাহার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় তাঁহাকে জানাইলাম ও সকল দিক ঘুরাইয়া দেখাইলাম।

"আপনি আমার নিকট কি আশা করেন ?"

"কাহারো নিকট কিছু প্রার্থনা করা আমাদের নীতি বহির্ভূত। আমাদের পরিকল্পনার কথা আমরা জানাইতে পারি ; তাহাতে আপনি আনুকূল্য করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহার পরিমাণ কি আমরা নির্দেশ করিতে পারি ? দাতা যাহাই দেন তাহাই আমরা সাদরে গ্রহণ করি।"

"এই নিন্।"

গণিয়া দেখি ২৫০৲ টাকা।

"পরে আর একখানা চেক পাঠাইয়া দিব।"

কয়েকদিন পরেই ২৫০৲ টাকার চেক আসিল।

আর একদিন। গোপালবাড়ী সম্পর্কে একটি মোকদ্দমা হাইকোর্টে। সেইদিন দুপুরের ট্রেনে খুলনায় পৌঁছিয়া রাত্রির ট্রেনে কলিকাতায় রওনা হইতে হইবে। হাত শূন্য। বাগেরহাটের গোবিন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়ী গিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "বিশেষ দরকার, ১০টী টাকা ধার দিন, কলিকাতা হইতে ফিরিয়াই দিব।" তিনি বলিলেন, "দশ টাকা দিতে পারি না, ১৲ টাকা গোপালকে দান করিলাম।" গোপাল খুলনায় পৌঁছার ভাড়াটাত জুটাইয়া দিলেন মনে করিয়া উহা নিয়া টিকেট কিনিলাম। বাগেরহাট ষ্টেসন হইতে ছাড়িয়া ট্রেন কলেজ ষ্টেসনে পৌঁছার পূর্বে একটা উচ্চ শব্দ কানে পৌঁছিল—

"উপেনবাবু না ?"

"হ্যাঁ।"

অমনি ভীড় ঠেলিয়া কাছে আসিতেছেন,—দেখি, চাপাতলার ভারতচন্দ্র হালদার। "আমি গোপালের জন্য কয়েকদিন আগেই ৫০টী টাকা জোগাড় করিয়া রাখিয়াছি, ভাল হইল, হঠাৎ আপনাকে পাইলাম" বলিয়া ৫০টী টাকা আমার হাতে দিলেন। বলিলাম,—"কলিকাতা হইতে ফিরিয়া রসিদ দিব"।

টাকা পাইয়া মনে মনে বলিলাম "গোপাল, আমরা ভাবি আমরা তোমার জন্য কত খাটিতেছি, কিন্তু আসলে তোমার কাজ তুমিই করিয়া যাইতেছ।"

আরো একদিন গোপালের কাজের জন্য টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় বন্ধুবর উকীল শরৎচন্দ্র নাথ মহাশয়ের কাছে গিয়া দু'শ' টাকার বিশেষ প্রয়োজনের কথা বলিলাম। তিনি উত্তর দিলেন যে, তাঁহার কাছে মক্কেলের টাকা আছে, তাহা হইতে দিতে পারেন, তবে যেদিন মক্কেল চাহিবে সেই দিনই ফেরৎ দিতে হইবে। "এখন ত দিন, পরের কথা পরে, গোপাল আছেন না?" বলিয়া দু'শত টাকা নিলাম।

গোপালের কাজের জন্য হাওলাত করিতে খুব অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। কি প্রকারে হাওলাত শোধ দিব, টাকা নিবার সময় তাহা কখনো ভাবি নাই। এইরূপে এক সময় ৭।৮ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে দলিলের দেনা খুবই কম; বিশ্বাস করিয়াই অনেকে গোপালের কাজের জন্য ধার দিতেন।

শরৎবাবু আমাকে যে টাকা ধার দিয়াছিলেন, কিছুদিন যাবৎ সে সম্বন্ধে তিনি আমাকে কোন কথাই বলেন নাই। মার্চ মাস, চাকুরীর কাজের তাগিদে মফস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, ঘাটে নৌকাও প্রস্তুত হইয়া আছে—এমন সময় শরৎবাবুর মুহুরী আসিয়া বলিলেন, "বাবু পাঠাইয়াছেন, মক্কেল আসিয়াছে, তিনি যে দু'শ' টাকা হাওলাত দিয়াছিলেন তাহা এখন দিতে হইবে।" তাঁহাকে বসিতে বলিলাম এবং এখন কোথায় টাকা পাইব ভাবিয়া অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলাম, কারণ তখন আমার কাহারও নিকট যাইবার সময় নাই, দেরী করিলে রামপাল যাইবার গোন্ সরিয়া যায়। ভাবিতে ভাবিতে পায়খানায় যাইতে হইল। পায়খানায় গিয়া ভাবিতেছি,—গোপাল, কি করা যায়, ভদ্রলোক আমাকে

বিশ্বাস করিয়া যে সর্তে টাকা দিয়াছেন তাহা ভঙ্গ হইলে অত্যন্ত হীন হইতে হইবে, অথচ এই মুহূর্তে দু'শ' টাকা পাই কোথায়? মুহরী মহাশয়কেই বা কি জবাব দিই! হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, "উপেনবাবু, বাড়ীতে আছেন কি?" সত্বর বাহিরে আসিয়া উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, আছি"। উঠানে নামিয়া দেখি—পিওন দাঁড়াইয়া। "কি, চিঠি আছে?" জিজ্ঞাসায় পিওন বলিল, "না আপনার দু'শ' টাকার একটা মণিঅর্ডার আছে।" পিওনের কথা শুনিয়া আমার মনের মধ্যে কি যে একটা ভাব উপস্থিত হইল—আনন্দ, না বিস্ময়, না করুণাবোধ তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে শুধু বলিতে লাগিলাম, "গোপাল, এত দয়া তোমার, এত করুণা!" মণিঅর্ডারের কাগজখানি হাতে নিয়া দেখি— ২০০৲ টাকা, প্রেরক জগন্নাথ দত্ত, কলিকাতা। জগন্নাথবাবু আমার বাল্যবন্ধু, বাড়ী কোমরপুর গ্রামে, কলিকাতায় ব্যবসা করেন। ৮।৯ মাস পূর্বে কলিকাতায় একদিন ইঁহাকে গোপালজীউর আনুকূল্য করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। আশা দিয়েছিলেন, কিন্তু এতদিন তাঁহার কোন খবর না পাইয়া উহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কুপনে লিখিয়াছেন, "ভাই উপেন, অনেকদিন পূর্বে তুমি শ্রীশ্রীগোপালসেবার জন্য আসিয়াছিলে; নানা কারণে ব্যস্ত থাকায় এযাবৎ কিছু করিতে পারি নাই। আজ সামান্য কিছু পাঠাইলাম, দয়া করিয়া গ্রহণ করিয়া গোপালসেবায় লাগাইও।"

ফরমে সই করিয়া টাকা নিবার সঙ্গে সঙ্গেই শরৎবাবুর মুহরীকে উহা দিয়া দিলাম।

গোপালের কাজ করিতে করিতে এইরূপে তাঁহার করুণার স্পর্শ বহুবার বহুভাবে পাইয়া ধন্য হইয়াছি। জয় গোপাল! জয় দীনদয়াল!

শ্রীশ্রীগোপালের কাজে অর্থের অনটনে ও মালি-মোকদ্দমা ব্যাপারে মন সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকায় অনেক সময় আমার বিস্মৃতি

আসিত। স্নান করিয়া ভিজা কাপড় মেলিয়া দিয়াছি, মনে করিতেছি গামছা পরা আছে, কিন্তু গামছা কাঁধে। পায়খানায় গিয়া বসিয়াছি, পরে খেয়াল হইল—জলপাত্র আনি নাই। এরূপ অবস্থায় চাকুরীর কর্তব্য যথাযথরূপে সম্পাদন সম্ভব নয় বলিয়া কয়েকবার চাকুরী হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে। শ্রীশ্রীগোপাল সম্বন্ধে এত তন্ময়তা, বোধ হয়, তিনি ঐরূপ অভাবের মধ্যে না রাখিলে সম্ভব হইত না।

ভিক্ষার্থে ঝালকাটি গমন ও সাক্ষীদের নামপ্রাপ্তি

১৯১৩ সালে বাগেরহাটের ধর্মপ্রাণ S.D.O. নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে শ্রীশ্রীগোপালের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন—ইহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। একদিন শুনিলাম, নীহার বাবু বরিশালে S.D.O. হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত ত্রৈলোক্যবাবুর ও আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতি ছিল। তাঁহার সাহায্যে বরিশাল ও ঝালকাটি হইতে গোপালের জন্য কিছু সাহায্য সংগ্রহ করা যায় কিনা ভাবিয়া আমরা বরিশালে যাইতে চাহিয়া তাঁহাকে পত্র দিলাম। বরিশাল ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছিয়া দেখি, আমাদিগকে বাসায় নিবার জন্য নীহারবাবু ঘাটে লোক পাঠাইয়াছেন। তাঁহার বাসায় পৌঁছিলে তিনি যে ভাবে আমাদিগকে বৈষ্ণবোচিত অভ্যর্থনা জানাইলেন তাহা জীবনের একটি স্মরণীয় বস্তু। তখন তাঁহার কোর্টে যাইবার সময় হওয়ায় আমাদের সহিত কথা হইল না। বাসায় ফিরিলে গোপালকমিটী, জমিদারদিগের সহিত ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে কথাবার্তা হইল। তিনি দুইদিন পরে ঝালকাটি যাইবেন বলিয়া, পরদিনই আমাদিগকে তথায় যাইতে বলিলেন। তখন বাহিরদীয়ানিবাসী রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঝালকাটি গুরুধাম কাছারীর ম্যানেজার। তিনি

ত্রৈলোক্যবাবুর আত্মীয়। আমরা তাঁহার কাছারীতে উঠিলাম। ঐ জমিদারীর মালেক ভূকৈলাসের রাজা। কাছারীবাড়ীটী পূর্বে নীলকুঠী সাহেবদের বাংলো ছিল। ওখানে খুব আদরযত্নে অভ্যর্থিত হইলাম। রাত্রে শয্যাগ্রহণ সময়ে ত্রৈলোক্যবাবু বলিলেন "হে গোপাল, তুমি আমাদেরত খুব সুখসুবিধার ব্যবস্থা করিলে, এখন তোমার নিজের সেবার কি ব্যবস্থা কর, দেখি।"

শ্রীশ্রীগোপালের সম্পত্তি সম্বন্ধে জমিদারপক্ষ মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন, আমরা তাহার জবাব দাখিল করিয়াছি, সাক্ষী মানিবার দিন ধার্য হইয়াছে; কাহাদিগকে সাক্ষী মানিব সর্বদাই এই চিন্তা করি। এই মোকদ্দমায় গোপালের সম্পত্তি থাকিবে অথবা যাইবে, কারণ এটা ছিল test suit. রাত্রে শয়নের পর ঐ বিষয় ভাবিতেছি, একটু তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে; দেখিলাম, এক দিব্যমূর্তি বলিতেছেন, "কিসের চিন্তা করছিস, আমার মোকদ্দমার সাক্ষী মানিবার?" উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, তাই।" মূর্তিটী তখন কয়েকটী নাম বলিয়া বলিলেন, "এই সব লোকদের সাক্ষী মানবে তবে অভীষ্টসিদ্ধি হবে।" আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, উঠিয়া পড়িলাম, ঘড়িতে দেখিলাম রাত্রি ১টা। তখন আলো জ্বালিয়া কাগজকলম লইয়া নামগুলি লিখিয়া লইলাম। ত্রৈলোক্যবাবুকে একথা জানাইলাম না।

নীহারবাবু যথাসময়ে ঝালকাটি আসিলেন। ম্যানেজার-বাবুকে নিয়া তাঁহার সহিত আমরা দেখা করিলাম। স্থানীয় কয়েক জন ব্যবসায়ীকে ডাকা হইল। তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীগোপালজীউর কথা জানাইলাম। তাঁহারা সাহায্য দিবার জন্য আমাদিগকে কয়েক মাস পরে যাইতে বলিলেন। আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

বাগেরহাটে পৌঁছিয়া আমাদের উকিল গিরিশচন্দ্র দাশ মহাশয়কে সাক্ষীদের নামপ্রাপ্তির বিষয় জানাইলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মামলায় আমরা নিশ্চয় জিতবো।"

পরে আদালতে নাম দাখিল হইল। জমিদারপক্ষ ক্রমাগত সময় নিতে লাগিলেন। শুনানীর দিন ধার্য হইলে জমিদারপক্ষ হইতে প্রস্তাব আসিল—তাঁহারা যাহাতে সম্মানের সহিত বাহির হইয়া যাইতে পারেন এমনভাবে মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলা হউক। আমরা বলিলাম, "গোলমাল করা, কাহাকেও জব্দ বা অমর্যাদা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমাদের একমাত্র লক্ষ্য গোপালের ন্যায্য স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা ও সেবাদির ব্যবস্থা করা; সুতরাং আপোষে মোকদ্দমা মিটাইতে আমাদের আপত্তি নাই।" উভয় পক্ষের উকীলবাবুদের পরামর্শে মোকদ্দমা এই মর্মে সোলে নিষ্পত্তি হইল যে, জমিদারপক্ষ জানিতে পারিলেন যে বিরোধীয় জমিজমা গোপালের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, অতএব তাঁহারা উহা গোপালের কাজের জন্য কমিটীকে দান করিলেন। (Bagerhat Munsif Court T.S. No. 398 of 1928)

রামলাল অধিকারীদ্বারা আমাদের নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা

জমিদারপক্ষ স্বত্বের মোকদ্দমায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া কি উপায়ে গোপালমন্দির কমিটীকে বিব্রত ও বিতাড়িত করা যায় তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। লাউপালা গ্রামের রামলাল অধিকারী আমাদের সহিত খুব মিলামিশা করিতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহার সহিত সরলভাবে মিশিতাম। তাঁহার বাড়ীতে একবার নামযজ্ঞ হয়, আমরা তাহাতে যোগদান করিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীগোপালের দোলের পর অষ্টম দোলের সময় জমিদারপক্ষ উহার দ্বারা এই মর্মে এক ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করাইলেন যে, দ্বারিকা অধিকারী তাঁহার পিতা নিত্যধামগত বালকদাস বাবাজী তাহাদের শিষ্য বাবাজীর অন্তর্ধানের পর হইতে তিনিই গোপালের সেবা করিয়া

আসিতেছেন, এবং তাহার পিতা দ্বারিক অধিকারী সেবাইত ছিলেন। বালকদাস বাবাজী অষ্টমী দোলের দিন অপ্রকট হয়েন, তজ্জন্য তাহারা ঐ অষ্টম দোল উপলক্ষে তাঁহার (বালকদাস বাবাজীর) উৎসব করিয়া আসিতেছেন। এই বৎসর তাঁহারা উৎসবের আয়োজন করেন, ৫০০ শত লোকের মত অন্নাদি রান্না করা হয় এমন সময় আমি (উপেন্দ্রনাথ কর) ১৫।২০ জন লোকসহ তাঁহাদের জিনিসপত্র সব ফেলিয়া দিয়াছি এবং তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছি। ঐ মোকদ্দমার ১নং আসামী আমি (Case No. 864 of 1925). ঐ সময় S.D.O. হরেনবাবু বদলী হওয়ায় সালে আহম্মদ নামে এক মুসলমান ভদ্রলোক S.D.O. হইয়া আসেন। ইহাকে একটি সুযোগ মনে করিয়া জমিদারপক্ষ ঐ মিথ্যা ফৌজদারী দায়ের করেন। শুধু এইবার নয় ; পুরাতন S.D.O. বদলী হইয়া নূতন S.D.O. আসিলেই জমিদারপক্ষ আমাদিগকে হয়রান করিবার চেষ্টা করিতেন। S.D.O. সন্তুষ্ট হইবেন আশা করিয়া জমিদারপক্ষ তৎকালীন M.L.C. সৈয়দ সুলতান আলি সাহেবকে উকীল ও তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ আমীর আলি সাহেবকে মোক্তার নিযুক্ত করিলেন। এই মোকদ্দমার কিছু দিন পূর্বে তারকেশ্বর মন্দিরে সেবার ত্রুটী ও মোহান্তের কদাচারের প্রতিকারোদ্দেশ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে গভর্ণমেণ্ট তারকেশ্বর মন্দির পরিচালন জন্য একটী কমিটী গঠন করেন। মোকদ্দমায় উক্ত আইনজীবিগণ S.D.O.-কে এই মর্মে বুঝাইলেন যে, এটি কংগ্রেসের একটি রাজনৈতিক চাল। কংগ্রেস মন্দির ও সম্পত্তি হাত করিবার জন্য ঐরূপ কার্যাদি করিতেছে, এমন কি গোপালবাড়ীতে বহু কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারের আড্ডা ইত্যাদি। যাহা হউক, S.D.O. ইউনিয়ন কমিটীর চেয়ারম্যান ভগীরথ সেন মহাশয়ের উপর তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার আদেশ দিলেন। ভগীরথবাবু মানসার রামনগর

জমিদারবাবুদের কাছারীর ম্যানেজার, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নেপালবাবু একজন S.D.O. দ্বিতীয় পুত্র রাখালবাবু জিলা-জজ; এইজন্য ভগীরথবাবুর উপর S.D.O. সাহেবের খুব শ্রদ্ধা ছিল। ভগীরথবাবু ন্যায়বাদী ও ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। উভয়পক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণ ও বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তিনি রিপোর্ট দিয়া দিলেন। তাঁহার রিপোর্টটী অতি মূল্যবান, ঐতিহাসিক দলিল বিধায় এই গ্রন্থের শেষদিকে মুদ্রিত হইল। S.D.O. সাহেব উক্ত রিপোর্ট দেখিয়া ও বাগের-হাটের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত আলোচনায় প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া আমাকে বলিলেন, "গোপালবাড়ীর ব্যাপারে আপনাদের যদি রাজনৈতিক মতলব না থাকে তবে বাগেরহাটের হিন্দু সাব-ডেপুটী, সিনিয়র মুনসেফ, হাইস্কুলের হেডমাষ্টার তারকচন্দ্র দত্তগুপ্ত, গভঃ উকীল রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাগেরহাট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কামাখ্যাচরণ নাগ মহাশয়গণকে গোপালকমিটীর সভ্য করিয়া লউন।" আমি উত্তর দিলাম, "উত্তম, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই; অধিকন্তু ইহা দ্বারা আমরা উপকৃতই হইব এবং গোপালসেবার সহায়তাই হইবে।" S.D.O. সাহেবের প্রস্তাবানুযায়ী আমি প্রথমেই সাব-ডেপুটীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন যে, S.D.O.-র সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব নাই বলিয়া তিনি এইরূপ সাধারণকার্যে যোগদানে অনিচ্ছুক। মুনসেফবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন যে, যে সব প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি আছে—হাইকোর্টের সার্কুলার মতে সেই সব প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহারা যুক্ত হইতে পারেন না। এমন কি S.D.O. নিজেও তাঁহাকে এ-বিষয়ে বলিয়া সম্মত করাইতে পারেন নাই। ইহার পর অপর তিনজন—হেডমাষ্টার তারকবাবু, সরকারী উকীল রমানাথবাবু ও প্রিন্সিপ্যাল কামাখ্যাবাবুকে বিশেষভাবে বলিয়া তাঁহাদের সম্মতি পাইলাম। গোপালমন্দির কমিটীতে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্রয়ের আগমনে সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট

হইলেন, এবং ইহাকে সালে আহম্মদ সাহেবের মাধ্যমে শ্রীশ্রীগোপালের কৃপা বলিয়াই আমরা মনে করিলাম। এদিকে রামলালের ফৌজদারী মোকদ্দমা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় S.D.O. তাঁহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করিবার হুকুম দিলেন; কিন্তু আমরা তাহাতে কোন তদ্বির না করিয়া আপোষে মিটাইয়া ফেলিলাম।

নিবারণ দাসকর্তৃক গোপালবাড়ী দখলের চেষ্টা ও ফৌজদারী মোকদ্দমা

বাগেরহাটের পূর্বদিকে ৫ মাইল দূরবর্তী চরকাটি গ্রামের নিবারণচন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে গোপালবাড়ীতে আসিতেন। বিভিন্ন স্থানে নামযজ্ঞের উৎসবে তিনি আমাদের সহিত যোগদান করিতেন এবং কখনো কখনো গোপালের কোন কোন কাজেও সাহায্য করিতেন। কয়েক মাস পরে ইনি বাগেরহাট হইতে আমার টুটপাড়ার বাড়ী যাওয়ার তারিখ জানিয়া তাহার পূর্বদিন সেখানে গিয়া আমার পিতাকে বলেন যে, তিনি আমার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, আমার পিতা যদি আমাকে সম্মত করাইয়া দেন তবে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইতে পারে। পরদিন আমি বাড়ী গিয়া উহাকে দেখিতে পাইলাম এবং পিতৃদেবের নিকট হইতে সকল বৃত্তান্ত জানিলাম। পিতৃদেবকে আমি বলিলাম, "আপনি বলেন কি?" আমি কাহাকেও দীক্ষা দিবার অধিকারী নহি; তবে যদি উনি এক বৎসর মৎস্যাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিনাম করেন ও বৈষ্ণবাচার পালন করেন তবে উপযুক্ত গুরুর দ্বারা দীক্ষা দেওয়াইয়া দিব।" বাবা ও নিবারণ আমাকে অনেক বলিলেও আমি দীক্ষা দিতে সম্মত হইলাম না। পূর্বেই বলিয়াছি, গোপালবাড়ীতে তখন স্কুল ও আশ্রমের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং কংগ্রেস-কর্মীরাও

তাঁতশিল্পের কাজ করিতেছেন। ঐ সময় লাউপালাগ্রামের নৈতিক-মান খুব উন্নত ছিল না, এই জন্য আমার নির্দেশ ছিল যে, কোন স্ত্রীলোককে কেহ কখনো গোপালবাড়ীতে রাত্রিযাপনের অনুমতি না দেন—সেই স্ত্রীলোক—যাত্রীই হউন বা কাহারো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হউন। একদিন দ্বিপ্রহরে একজন অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যাত্রী হিসাবে ওখানে আসিলেন, প্রসাদ পাইলেন; কিন্তু অপরাপর যাত্রিগণ চলিয়া গেলেও তিনি "আমার লোক আসিলে যাইব" বলিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা আগত দেখিয়া আশ্রমের সেবকগণ তাঁহাকে অন্য বাড়ীতে গিয়া বসিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি যাইব কেন? এ-তো আমার শ্বশুরের বাড়ী। আমরা এখানে বরাবর বাস করি, এখান থেকে আমাকে তাড়ায় কার সাধ্য?" ঠিক এই সময়ই কয়েকজন লোকসহ উক্ত নিবারণ দাস আসিয়া বলিল, "ইনি আমার মা, বালকদাসবাবাজী ইঁহার শ্বশুর ও আমার ঠাকুরদাদা। আমরা এখানে পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছি, আমাদের তাড়ায় কে?" তখন আশ্রমের সেবকগণ উঁহাদিগকে সজোরে বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। রাত্রে নিবারণ জমিদারের কাছারীর লোকজনের সহিত পরামর্শ করিয়া বৃদ্ধা মাতার শরীরে কয়েকটী দাগ কাটিয়া পরদিন বাগেরহাটে গেলেন। সেখানে ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইয়া গোপালবাড়ীর ৮।১০ জন সেবকের নামে এক ফৌজদারী মোকদ্দমা দাখিল করেন। ফৌঃ মোকদ্দমার মর্ম—"লাউপালার গোপাল-বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা বালকদাস বাবাজী আমার ঠাকুরদাদা, তাঁহার মৃত্যুর পর আমার পিতা গোপালের সেবাদি করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মাতা ও আমি ওখানে বাস করিয়া সেবাদি চালাইতেছি। গতকল্য সন্ধ্যাবেলায় আসামীগণ মাতাকে ও আমাকে বলপূর্বক গোপালবাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে এবং গোপালের তহবিলে ২০০৲ টাকা ছিল, তাহা ছিনাইয়া লইয়াছে, আর অস্থাবর

সম্পত্তিও তছরূপ করিয়াছে।" অস্থাবর জিনিষের একটি তালিকাও দরখাস্তে লিখিত হয়। (Case No. 870 of 1925 u/s. 323, 147, 329, 342, 504, 307) নিবারণ মাঝে মাঝে ওখানে যাতায়াত করিত বলিয়া জিনিষপত্রের তালিকা দেওয়া তাহার পক্ষে কঠিন ছিল না।

এই মোকদ্দমা চলিতে থাকাকালে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর এক অধিবেশন হয়,—সভাপতি সুবিখ্যাত নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। সভায় এই মর্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়—খুলনা জেলায় বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত লাউপালা গ্রামে শ্রীশ্রীগোপালবিগ্রহ, মন্দির ও সম্পত্তি আছে তাহা মাহিষ্য-প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ছিল। কিছুদিন হইতে মাহিষ্য-সেবকবৃন্দকে অবৈধভাবে বিতাড়িত করিয়া তাহা অন্যেরা দখল করিতেছে। অতএব উহার বিবরণ সংগ্রহ ও উদ্ধারের জন্য একটি কমিটীর উপর ভার অর্পিত হউক।

কয়েকদিন পরে মেদিনীপুর ও যশোহর হইতে কয়েকজন মাহিষ্য আইনজীবী বাগেরহাটের মাহিষ্য-আইনজীবী নগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বাসায় আগমন করেন। উঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য নগেনবাবু আমাকে অনুরোধ করেন। আমি কাগজ-পত্র সহ তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া গোপালবাড়ীর আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করি। নিবারণ ও তাহার সহযোগীরাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। দলিলপত্রের প্রমাণাদি দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইলাম যে, শ্রীমৎ বালকদাস বাবাজী ছিলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বা বৈরাগী। তাঁহার দেহান্তে তাঁহার ত্যাগী বৈষ্ণবেরাই মন্দিরের সেবাইতের পদ দখল ও সেবাদি পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার পারিবারিক জীবনের আত্মীয়গণের গোপালবাড়ীর সেবাদি পরিচালন বিষয়ে কোনদিন কোন সম্পর্কই ছিল না। বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের পর যথাক্রমে কৃষ্ণদাস বাবাজী ও গোবিন্দ-

দাস বাবাজী মোহান্ত হয়েন। পরে সখিচরণ দাস বাবাজী প্রায় ৫০ বৎসরকাল মোহান্ত ছিলেন। তাঁহার নাম ১২৭২ বাং সালের জরীপি চিঠায় দেখা যায়। তিনি মোহান্ত থাকা কালে বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিদ্বারা মন্দিরাদি মেরামতের জন্য আবেদনপত্র প্রচার করেন, বড় পুষ্করিণীটী খনন করান। ঐ কার্যে কিছু অর্থের অনটন হওয়ায় সেবাইতরূপে তিনি শ্রীশ্রীগোপালের সম্পত্তি রাংদিয়ার জমিদারের নিকট বন্ধক রাখিয়া কয়েকশত টাকা কর্জ লইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত জাজ্বল্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মাহিষ্যাধিকারের সম্পত্তি বলিয়া দাবী উত্থাপন ও তজ্জন্য কমিটীকে হয়রান করিবার চেষ্টা করিলে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের ইতিহাসলেখকগণ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না—ইহা তাঁহাদিগকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, মাহিষ্য-প্রতিনিধিবৃন্দ প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ঐরূপ জাতিগত সম্পত্তি বলিয়া আর কাহাকেও কখনো অগ্রসর হইতে দেখি নাই। অতঃপর নিবারণ চন্দ্রের ফৌঃ মোকদ্দমা মিথ্যা সাব্যস্ত হয়।

সেটেলমেণ্টের সময় গোলযোগ

সরকারী সেটেলমেণ্টের ১০৩ ধারায় জমিদার পক্ষ স্বয়ং নিবারণ দাস ও রামলাল অধিকারী—এই তিনপক্ষই গোপালের যাবতীয় সম্পত্তির প্রতি দাগেই আপত্তি দাখিল করেন। জমিদারের দাবী তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, নিবারণের দাবী পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া এবং রামলালের দাবী শিষ্যের সম্পত্তি বলিয়া। সেটেলমেণ্ট অফিসার এই সব মোকদ্দমার বিচার করিতেন জমিদারের কাছারিবাটীতে। জমিদারপক্ষ ও অপর দুইপক্ষ বাগেরহাটের আইনজীবী মণীন্দ্রনাথ বসু ও নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়কে উকীল নিযুক্ত করিলেন।

শ্রীশ্রীগোপালের পক্ষে জমিদারের কাছারীতে কোন উকীল

নেওয়া সম্ভব না হওয়ায় শ্রীশ্রীগোপালের নাম করিয়া তাঁহার পক্ষের বক্তব্য বলিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইলাম। মণীন্দ্রবাবুর স্বভাবসিদ্ধ কটাক্ষোক্তি ও আমার সমুচিত জবাব চলিবার পর লাউপালা মৌজার কাজ সুসম্পন্ন হইল। বাতুখালি ও রঘুনাথপুর মৌজা সম্বন্ধে তায়দাদে ৮১/ বিঘা জমির উল্লেখ থাকিলেও দ্বারিক অধিকারীর সেস-রিটার্ণে ও সখিচরণ মোহান্তের বন্ধকী দলিলে ৬০/ বিঘা জমির উল্লেখ ও ১২৭২ সালের জরীপের চিঠার দাগ লিখিত ছিল। সেটেলমেণ্ট কালে দখল দেখাইবার জন্য আমি পূর্ব হইতেই কয়েকজন প্রজা ঠিক করিয়া দাখিলা ও দলিল করাইয়া রাখিয়াছিলাম। এইরূপে কতক জমি প্রজার দখলে ও কতক খাসে থাকে। অবশ্য গোপালের এই সব জমি জমিদার তাঁহাদের খাস বলিয়া বাসাবাটীর শুকলাল নাগ মহাশয়কে ও কাঁঠাল গ্রামের প্রসন্নকুমার দে মহাশয়কে জমা দিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ঐ জমি উদ্ধার করা কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়। বিচারকালে আমাদের দাখিলী সেস-রিটার্ণ ও বন্ধকী-দলিলের নকল বিপক্ষের উকীলবাবুগণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিলেন না। উকীলগণের তর্কবিতর্কের সময় রঘুনাথপুর নিবাসী খগেন্দ্রনাথ দাস তাঁহার কাজে ওখানে উপস্থিত ছিলেন। খগেন্দ্র ও নগেন্দ্র দুই ভাই আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। খগেন্দ্র আমাকে ঐ সময় বলিলেন যে, তাঁহার পিতা যাত্রাপুর কাছারীতে চাকরী করিতেন এবং ১২৭২ সালের বাতুখালি ও রঘুনাথপুর মৌজার জরিপী চিঠার নকল তাঁহাদের বাড়ীতে আছে, তখনই তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে গেলে দেখাইতে পারেন। শ্রাবণ মাস, বৃষ্টি পড়িতেছে, তবুও খগেনকে নিয়া আমি তাহাদের বাটীতে রওনা হইলাম। রঘুনাথপুরের কাদা হইতে পা টানিয়া তোলা কষ্টকর, একখানা লাঠির সাহায্যে অতিকষ্টে ৫ মাইল হাঁটিয়া রঘুনাথপুরে পৌঁছিলাম। সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিবার পর

খগেন্দ্রনাথ আমার আহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "আহারের কোন প্রয়োজন নাই, তুমি পরচাগুলি আন, গোপালের কাজে লাগিয়া যাই।"

খগেন্দ্রনাথ তখন দুই মৌজার কাগজ আনিয়া দিল। সে এক কাগজের পাহাড়,—হইলে কি হইবে? গোপালের নামে দৃঢ়মনে কাগজগুলি এক একখানা করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। কাজের তন্ময়তায় ঘুমের কথা মনে নাই। অফিসার আমাকে মাত্র একদিনের সময় দিয়াছেন—পরদিন ১০টার মধ্যে পরচা দেখাইতে হইবে। ভোর প্রায় চারিটায় গোপালের দয়া হইল; একে একে সকল পরচাই পাওয়া গেল। তখন আমার আনন্দ আর ধরে না। অনাহার, অনিদ্রা ও পথক্লেশ সার্থক হইল। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া প্রয়োজনীয় কাগজগুলি নিয়া অফিসারের সম্মুখে দাখিল করিলাম। উহা দেখিয়া প্রতিপক্ষের উকীলগণ হতাশ হইলেন। অফিসার শ্রীশ্রীগোপালের অনুকূলে রায় দিলেন। দেখিলাম যাঁহার কাজ তিনিই করাইয়া লইলেন।

যাত্রাপুর নূতন কাটাখালের দুই পার্শ্বের ক্যানাল ডিপার্টমেণ্টের জমির বিবরণ

পূর্বে যাত্রাপুর ও লাউপালা ভৈরবনদের এক পারে ছিল। ওই দুই মৌজার মধ্যদিয়া খাল কাটিবার সময় সরকার জমি acquire করিয়া যাত্রাপুরের নূতন খাল (Jatrapur New cut) কাটেন। খালের মাটি ফেলিবার জন্যও সরকার কতকগুলি জমি দখল (এ্যাকয়ার) করেন। এই জন্য যাত্রাপুব খেয়াঘাটের ও যাত্রা-পুব ও লাউপালার দুই ধারের খালপাড়ের জমি সরকারের জমি হইল। লাউপালার রথ মিলাইতে লাউপালা পারের নদীর কিনারার ক্যানালের জমি না পাইলে মেলায় যে অগণিত ব্যবসায়ী নৌকা-যোগে আসেন তাঁহারা নৌকা ভিড়াইতে পারেন না। আলাইপুব

হইতে যাত্রাপুর খাল পর্যন্ত প্রায় ৮০০/বিঘা জমি সরকার একসাথে বন্দোবস্ত দিতেন এবং রমানাথ মিত্র কন্‌ট্রাকটর বন্দোবস্ত লইতেন। আমরা শ্রীশ্রীগোপালসেবার কাজ হাতে লওয়ার সাথে সাথে ঐ জমি না পাইলে রথের মেলা মিলান অসম্ভব বুঝিয়া রমানাথবাবুর নায়েব পঞ্চানন রায়ের নিকট হইতে ঐ জমি বন্দোবস্ত করিয়া লই। নদীর উভয় পারে ৫।৬ বিঘা জমি হইবে। রমানাথবাবু কয়েক বৎসর ঐ জমি বন্দোবস্ত নিবেন না স্থির হওয়ায় এবং সরকার উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া বন্দোবস্ত দিবেন না জানিতে পারিয়া, আমরা ঐ ৫।৬ বিঘা জমির জন্য আলাইপুর হইতে যাত্রাপুর পর্যন্ত ৮০০/বিঘা জমি ডাকিয়া লইলাম ও বিপিনবিহারী পালকে নায়েব নিযুক্ত করিলাম। নায়েব ঐ সকল জমির খাজনা আদায় করিয়া ডাকের টাকা তুলিলেন কিন্তু বহুলোক রীতিমত খাজনা না দেওয়ায় নানাপ্রকার অসুবিধা হইতে লাগিল। এইরূপে পর পর দুই বৎসর উক্ত জমি বন্দোবস্ত দিয়া দেখিলাম যে, আমাদের পক্ষে সমস্ত জমি ডাকিয়া নিয়া দীর্ঘ ৮।৯ মাইলব্যাপী জমির খুচরা খাজনা আদায় করা সহজ নহে। এইজন্য আমাদের প্রয়োজনীয় জমিটুকু —৫।৬ বিঘা মাত্র বন্দোবস্ত লওয়া যায় কিনা ভাবিতে লাগিলাম। ঐ সময় P.W.D. ও Irrigation একই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রায়বাহাদুর অন্নদাপ্রসন্ন সরকার প্রথম বাঙ্গালী চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার হয়েন। তাঁহার কন্যার সহিত ভগীরথবাবুর কনিষ্ঠপুত্র জেলাজজ রাখাল সেন মহাশয়ের বিবাহ হয়। অন্নদাপ্রসন্নবাবুর সহিত ত্রৈলোক্যবাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, পরস্পর পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। এই নিমিত্ত ত্রৈলোক্যবাবুকে আমার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি বলিলেন যে, অন্নদাবাবু কিছু দিন পূর্বে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তবুও আমি বলিলাম যে, তিনি বর্তমান সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়কে একটু বলিয়া দিলে অনেক কাজ হইতে পারে। এই কথায়

ত্রৈলোক্যবাবু সম্মত হইয়া অন্নদাবাবুর সহিত দেখা করিতে যাইবেন বলিয়া কলিকাতায় তাঁহাকে পত্র দিলেন। ত্রৈলোক্য-বাবু ও আমি কলিকাতায় অন্নদাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয় বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জি-নিয়ারের সঙ্গে আমাদিগকে পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিতে রাজী হইলেন। রায় বাহাদুর শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় তখন সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার। আমার ওভারসিয়ারী পরীক্ষার সময় তিনি পরীক্ষক ছিলেন বলিয়া আমি তাঁহাকে চিনিতাম। পরদিন অন্নদাবাবু আমাদিগকে রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ গিয়া শৈলেনবাবুর সহিত দেখা করাইয়া বলিলেন, "এই ভদ্র-লোকেরা তোমার কাছে আসিয়াছেন, তুমি যদি ইঁহাদের কিছু উপকার করিতে পার তবে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।" শৈলেনবাবু ইতিপূর্বে অন্নদাবাবুর নিম্নস্থপদে কাজ করিতেন। তিনি আমাদের কথা সংক্ষেপে শুনিয়া বলিলেন, "ইহা একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাজ, আমার নহে।" আমি বলিলাম, "তাহা আমরা জানি, কিন্তু ইহাও জানি যে, আপনি ইচ্ছা করিলে ঠাকুরের কাজের বিশেষ আনুকূল্য করিতে পারেন—ইহা জানিয়াই আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি।" এই বাক্যটি বিশেষ আবেগ ও জোরের সহিত বলা হইয়াছিল।

তখন তিনি শ্রীশ্রীগোপালের ও আশ্রমাদির ইতিবৃত্ত শুনিতে চাহিলেন। আমরা গোপালজীউর আবির্ভাব, অলৌকিক লীলা ও শ্রীমদ্‌ বালকদাস বাবাজীর মাহাত্ম্যের কথা বলিয়া যাইতে লাগিলে তিনি তাঁহার জীবনের পরিবর্তনের কথা ও তাঁহার জীবনের ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তির কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। দারো-য়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, "এখন কোন বাবুকে ভিতরে আসিতে দিবে না।" প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্তা হইল এবং বলিলেন, আপনারা অভীপ্সিত মত একখানা দরখাস্ত করুন, যদি একজি-

কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুপারিশ না-ও করেন, তবু আপনাদের ইচ্ছা যাহাতে পূর্ণ হয় তাহার চেষ্টা আমি করিব।" আমরা এক্‌জি-কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার-এর সহিতও সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাঁহাকে ইহাও বলিলাম যে আমরা অবসরপ্রাপ্ত চীফ্-ইঞ্জিনিয়ার ও সুপারি-ণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার-এর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছি। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় জমিটুকু পৃথকভাবে বন্দোবস্ত পাইবার জন্য দরখাস্ত করিলাম। খুলনা P.W.D.-র এ্যাসিণ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার দরখাস্ত সুপারিশ করিলেন। ১৫।১৬ দিন পরে উত্তর আসিল—"যাত্রাপুর কাট্ (Cut)-এর দুই পার্শ্বের জমি পৃথক ভাবে গোপালমন্দির কমিটীর সম্পাদকের সহিত বন্দোবস্ত কর।" তাহাই হইল—ঐ জমিটুকু গোপালমন্দির কমিটীর সহিত তিন বৎসরের জন্য বার্ষিক ১২৷৷৹ টাকা হারে খাজনায় কর্তৃপক্ষ বন্দোবস্ত দিলেন। পর বৎসর জমিদারপক্ষ বন্দোবস্ত লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু P.W.D. বলিলেন যে, যদি গোপালমন্দির কমিটী বন্দোবস্ত না লয়েন তবেই অপরে পাইতে পারে, নতুবা নহে। সেবারেও কমিটী ১২৷৷৹ টাকায় বন্দোবস্ত লইলেন। তিন বৎসর অতিক্রম হইবার কিছুদিন পূর্বে জমিদারপক্ষ P.W.D.-র ইঞ্জিনিয়ার ও গভর্ণমেণ্টকে দরখাস্তদ্বারা জানাইলেন যে, যাত্রাপুর Cut-এর দুই পার্শ্বে ৬/ বিঘা জমি অতি মূল্যবান ও লাভজনক, উহা ডাকে তুলিলে ২০০৲ টাকা পর্যন্ত ডাক উঠিতে পারে এবং তাঁহারাই নগদ ২০০৲ টাকা দিয়া বন্দোবস্ত নিতে প্রস্তুত। এই সময় এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিসটী খুলনায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারবাবু ব্রাহ্মণ, তাঁহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে সপরিবারে গোপালবাড়ীতে আনিয়া দর্শন করাইয়াছি ও গোপালবাড়ীর সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছি। জমিদারপক্ষের দরখাস্তের সংবাদ তিনিই আমাকে জানান এবং বলেন, "৭।৮ দিন পরে চীফ্ইঞ্জিনিয়ার ও সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার

খুলনায় আসিতেছেন, এখান থেকে মাদারীপুরে যাইবেন। ভোর ৪টায় কলিকাতার যে ট্রেন খুলনায় পৌঁছে সেই ট্রেনে আসিয়া তাঁহারা লঞ্চে থাকিবেন। ঐ সময় আপনারা লঞ্চে গিয়া দেখা করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া বলিবেন।" মূলঘরনিবাসী খুলনার প্রসিদ্ধ উকীল প্রফুল্লচন্দ্র রায় গোপালবাড়ীর স্বার্থ দেখিতেন। তাঁহাকে কয়েকবার গোপালবাড়ীতে রথযাত্রার সময় নিয়া দেখাইয়া আনিয়াছি। তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া আমাদের মুখপাত্ররূপে ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়গণের কাছে আমাদের বক্তব্য বলিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি সম্মত হইলেন। তখন পৌষ মাস। নির্দিষ্ট দিনে রাত্রি ২৷৷০ টায় শয্যাত্যাগ করিয়া ৩টায় গিয়া প্রফুল্লবাবুকে জাগাইলাম এবং দুইজনে রাত্রি ৪টায় ষ্টীমারঘাটে পৌঁছিয়া প্রথমে একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার-এর সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে নিয়া চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি খাস বিলাতি সাহেব— কয়েক মাস মাত্র ভারতে আসিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য প্রফুল্ল বাবু সাহেবকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুখার্জি কি মুসলমান?" প্রফুল্লবাবু উত্তর দিলেন যে মুখার্জি হিন্দুসমাজের উচ্চতম স্তরের লোক, কিন্তু কর্মচারি-গণের স্বার্থ, প্ররোচনা ও সম্মানের জন্য মুখার্জি জমিদার এইরূপ করিতেছেন। চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলিলেন, "২।৪ শত টাকার জন্য ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগ চিন্তা করে না; পার্টি ভাল কিনা ইহাই আমার প্রধান বিবেচ্য বিষয়।" এই উক্তিটী আমরা আশাপ্রদ বলিয়া মনে করিলাম। তৎপর আমরা সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের সহিতও সাক্ষাৎ করিলাম। যথাসময়ে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার যে রিপোর্ট দিলেন, তাহাতে সেবারেও ১২৷৷০ টাকা খাজনায় শ্রীশ্রীগোপালমন্দির কমিটী ঐ ক্যানালের জমি বন্দোবস্ত পাইলেন। পরে জানিতে পারিলাম, ওভারসিয়ারকে বাধ্য করিয়া

জমিদারপক্ষ খেয়াঘাট ও নৌকা ঘাট লইয়া গোলমাল বাধাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সে-চেষ্টা একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিফল করিয়া দিয়াছিলেন।

সীতানাথ চক্রবর্তী দ্বারা উইলের মোকদ্দমা

যে সীতানাথ চক্রবর্তীকে জমিদার ১৯১৮ সালে নিরুপণপত্র ও খাজনা বাবদ কিস্তীবন্দী দলিল রেজেষ্ট্রী করাইয়া লইয়া কমিটী-নিযুক্ত পূজারীকে ছাড়াইয়া দিয়া শ্রীশ্রীগোপালের সেবাইতরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং যিনি মাত্র দুই বৎসর থাকিয়া সেবাদি কার্য চালাইতে অক্ষম হইয়া একটি লোক রাখিয়া চলিয়া যান এবং সেই লোকও ৬ মাস যাবৎ বেতনাদি না পাইয়া এস্.ডি.ও. জে.কে. বিশ্বাস-এর সময় কমিটীর নিকট হইতে বেতন লইয়া বিদায় হইয়া যান সেই সীতানাথ চক্রবর্তীকে আনিয়া জমিদারপক্ষ ১৯০৬ সালের উইল [যাহা সখিচরণ মোহান্ত সম্পাদন করিয়া পর বৎসর (১৯০৭ সালে) অপ্রকট হয়েন], সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা প্রবেটের মোকদ্দমা দায়ের করাইয়া দেন। আমরা ঐ মোকদ্দমার জবাব খুলনার প্রবীণ উকীল নগেন্দ্রনাথ সেন ও জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ দ্বারা লেখাইয়া হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখাইয়া আদালতে দাখিল করি। মোকদ্দমাটী প্রায় দেড় বৎসর চলিবার পর সীতানাথ পরাজিত হন। পরে সীতানাথ কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করেন। গোপালের পক্ষে কাজ করিবার জন্য আমরা উক্ত ব্রজলালবাবুকে ও ডক্টর যদুনাথ কাঞ্জিলালকে অনুরোধ করিলে তাঁহারা কাজ করিতে সম্মত হন। ব্রজলালবাবু পূর্ব হইতেই গোপালের যাবতীয় বৈষয়িক ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দিতেন। আর গোপালের কাজ আরম্ভ করিলে তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "ভায়া, সাধারণের কাজ করিতে যাইতেছ, গালাগালিটাকে কি বেমালুম হজম করা

অভ্যাস করিয়াছ?" আরো বলিলেন, "দৌলতপুর কলেজ আরম্ভ করি একটা খেজুর-বাগানের মধ্যে একটা পাটগুদামের টিনের ঘর নিয়া। তারপর এ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিলাম, কিন্তু কোন দিন কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই—এত টাকা কি ভাবে কোথা হ'তে যোগাড় হইল। কিন্তু এ-টা হয় নাই, ও-টা হয় নাই, এরূপ না হইয়া ঐরূপ হইলে ভাল হইত, উহা করিতে পারেন নাই —এইরূপ নিন্দাসূচক কথা বহুবারই শুনিয়াছি।"

হাইকোর্টে প্রবেটের মোকদ্দমা পরিচালনা সম্বন্ধে ব্রজবাবু ও যদুবাবু একমত হইতে পারিলেন না। যদুবাবু বলিলেন, "উইল-মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়া কনটেষ্ট (Contest) করিয়া কোন ফল হইবে না, কারণ এই মোকদ্দমায় স্বত্ব দেখিবে না, কেবলমাত্র উইলখানা খাঁটী কিনা তাহাই দেখিবে। আমি যদি কলিকাতার সহর কাহাকেও উইল করিয়া দেই, তাহারও প্রবেট দিতে আদালত বাধ্য। উইল-মোকদ্দমায় চালাইয়া হারিয়া গেলে, কি কারণে হারিলে তাহা লোকে বুঝিবে না, ফৌজদারী হাকিমেরাও বুঝিবে না, সকলেই বলিবে—হাইকোর্টে উহারা হারিয়াছে।" এই কথায় আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া আইনগ্রন্থ-প্রণেতা এ্যাডভোকেট সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নিকট গেলাম। তাঁহার নিকট আমরা ব্রজবাবু ও যদুবাবুর মতভেদের কথা বলিয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিলেন "হিন্দু আইন সম্বন্ধে হাইকোর্টে ব্রজবাবুর উপর অথরিটি কেহ নাই, কাজেই আমার মনে হয় মোকদ্দমা কনটেষ্ট করাই কর্তব্য।"

পরে ব্রজবাবুকে যদুবাবু ও সুরেনবাবুর অভিমত জানাইলে তিনি বলিলেন, "হাইকোর্টে একই মোকদ্দমায় একাধিক উকীল থাকিলে উকীলগণের মধ্যে যিনি সিনিয়র তিনিই সওয়াল করিয়া থাকেন। যদুবাবু সিনিয়র হইলেও এই মোকদ্দমার পরিণতির উপর তাঁহার যখন বিশ্বাস নাই, তখন আমাকেই সওয়াল করিতে

হইবে।" তিনি আরো বলিলেন,—"Caseটী হিন্দু'ল' (Hindu Law) ঘটিত, সুতরাং ইংরেজ জজের কোর্টে এই কেস্‌টী না হওয়া ভাল; কারণ ইংরেজ জজ হিন্দু আইনের সূক্ষ্ম মর্ম অনেক সময় বুঝিতে পারেন না। কাজেই একটু তদ্বির করিয়া Caseটী যাহাতে চীফ্ জাসটিশ (Chief Justice) স্যার নলিনীরঞ্জন চ্যাটার্জির কোর্টে হয় তাহার ব্যবস্থা কর।" ব্রজবাবুর মুহরী বেশ সুদক্ষ ছিলেন; তিনি সহজেই তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন। প্রধান বিচারপতির কোর্টে মোকদ্দমা উঠিল। অপর পক্ষ দুই তারিখ সাবকাশ লইলেন। শুনানীর দিন সীতানাথের উকীল দীর্ঘসময় ধরিয়া সওয়াল করিলেন, কিন্তু ব্রজবাবু অল্প সময়ে তাহার বক্তব্য শেষ করিলেন। ব্রজবাবুব বক্তব্যের সার কথা—"উভয় পক্ষ স্বীকার করিতেছেন যে, সম্পত্তি গোপালের। মোহান্ত সখিচরণ সেবাদি কার্যের জন্য সম্পত্তি সীতানাথকে উইল করিতেছেন। গোপাল দেববিগ্রহ মাত্র। বিগ্রহ চিরনাবালক (ever minor)। মোহান্ত তাঁর ম্যানেজার মাত্র। মনিবের কোন সম্পত্তি উইল করিবার অধিকার ম্যানেজারের থাকিতে পারে না। কাজেই ঐ দলিলটী উইল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহা একজন ম্যানেজার বা সেবাইত কর্তৃক অপর একজন ম্যানেজার বা সেবাইত মনোনয়নপত্র মাত্র। ঐ দলিল যখন উইল নহে, তখন উহার বনিয়াদে কোন প্রবেট হইতে পারে না।" ব্রজবাবুর সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ সওয়ালের পর সীতানাথের আপীল ডিস্‌মিস্ হইল। (Vide case No. 75 of 1924, D. J. Khulna. Appeal, Cal. High Court in 1926).

কমিটী-নিযুক্ত পূজারীকর্তৃক ফৌজদারী মোকদ্দমা

জমিদার পক্ষ প্রবেটের আপীলে বিফল মনোরথ হইয়া কমিটীকে অন্যভাবে বিপন্ন করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে

লাগিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ১৯১৮ সালে আমি চারিমাসের ছুটী নিয়া শ্রীধামপুরী ও শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাই। আমার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া জমিদারপক্ষ কমিটী-নিযুক্ত বিহারী ব্রজবাসী সেবাইতকে তাড়াইয়া দেন। কমিটী পরে তাঁহাকে পুনরায় সেবাইতপদে বহাল করেন। এবার জমিদারপক্ষ উঁহাকে নানারূপ প্রলোভনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় রথের মেলায় প্রায় তিন হাজার টাকা আদায় হইত এবং তাহা উৎসবে ও প্রসাদবিতরণে ব্যয় হইয়া যাইত। জমিদারের কর্মচারিগণ বিহারীকে এইভাবে প্রলোভন দিতে লাগিলেন—"তুমি কমিটীকে অস্বীকার করিয়া একটা মোকদ্দমা করিলে আমরা তোমাকে সাহায্য করিব, তাহাতে তুমি মোহান্ত হইতে পারিবে এবং রথমেলার আয় ও অন্যান্য আয় সবই তোমার হইবে।" বিহারী বিচক্ষণ প্রকৃতির লোক ছিলেন না; তিনি উহাদের কথায় প্রলুব্ধ হইয়া আমার ও আশ্রমের ৭।৮ জন সেবকের নামে এই মর্মে এক ফৌজদারী মোকদ্দমা করিলেন যে, বালকদাস বাবাজীর ওয়ারেশ ও তাঁহার (বালকদাস বাবাজীর) গুরুবংশের লোকেরা এ যাবৎ শ্রীশ্রীগোপালজীউর সেবা করিয়া আসিতেছেন, এবং বর্ত্তমানে বালকদাসের ওয়ারেশ নিবারণচন্দ্র দাস ও গুরুবংশের রামলাল অধিকারী উক্ত সেবা পরিচালনা করিতেছেন। পূর্বে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া গ্রামবাসিগণের ইচ্ছানুসারে দামোদর পূজারী সহ আমাকে সেবাদি কার্যে নিযুক্ত করেন। দামোদরের মৃত্যুর পর আমি একাই সেবাকার্য চালাইতেছি। সম্প্রতি উপেন্দ্র নাথ করের নামে রামলাল অধিকারী যে ফৌজদারী মোকদ্দমা করেন তাহাতে উপেন্দ্রবাবু আমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলায় এবং আমি তাহা না দেওয়ায় উপেন্দ্রবাবু ও তাঁহার পক্ষে অমুক অমুক ৭।৮ ব্যক্তি আমাকে মারধর করিয়া তাড়াইবার ভয় দেখাইতেছে এবং ঐরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছে,—এই মর্মে অভিযোগ থাকে।

(Case No. 12 M/156 of 1925, Bagerhat Criminal court) যথাসময়ে এই মোকদ্দমা দায়েরের সংবাদ পাইয়া আমরা এমন ব্যবস্থা করিলাম যাহাতে বিহারী বাগেরহাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া গোপালবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারেন। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আমরা গোপালবাড়ী সংলগ্ন স্থানে কংগ্রেস কর্মীদিগকে তাঁতশিল্প স্থাপন করিতে দিয়াছিলাম। উহারা আবশ্যকমত গোপালবাড়ী রক্ষা বিষয়ে সাহায্য করিতেন। টোল ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিল; তাহাতেও কিছু লোক ওখানে সর্বদাই থাকিতেন। গোপালের বর্গাদার রইজউদ্দিন সেখের সাহায্য পাওয়া যাইত। বিহারী বাগেরহাট হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে আর গোপালবাড়ীতে ঢুকিতে দেওয়া হইল না। পরদিন বিহারী নিজের গায়ে কিছু অস্ত্রের দাগ করিয়া ও ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইয়া এই মর্মে আর একটী ফৌজদারী দায়ের করেন, "গতকল্য আমি যে সকল আসামীর নামে ফৌঃ মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছি, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে গোপালবাড়ীতে ঢুকিতে দেয় না, আমাকে ভীষণভাবে মারপিট করে এবং নিম্নলিখিত সাক্ষিগণ উপস্থিত না থাকিলে আমাকে খুন করিয়া ফেলিত।" এ-সময়ে বাগেরহাটে S.D.O. ছিলেন মৌলবী সালে আহম্মদ। জমিদারপক্ষ হিন্দু S.D.O.-গণের আমলে কমিটীর বিরুদ্ধে কিছু করিতে না পারিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, মুসলমান S.D.O.-কে তাঁহারা প্রভাবিত করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে মুসলমান উকীল ও মোক্তার নিযুক্ত করিয়া S.D.O.-কে নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। কয়েকমাস পূর্বে তাঁহারা এই S.D.O.-র আমলে রামলাল অধিকারী দ্বারা মোকদ্দমা দায়ের করাইয়া কমিটীকে বিপন্ন করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল।

S.D.O. এই মোকদ্দমার বিষয় পুলিশকে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিতে আদেশ দিলেন। পুলিশ অফিসার পূর্ব হইতেই

কয়েকটী ব্যাপারে গোপালবাড়ীর পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন। পুলিশের রিপোর্ট বিহারীর বিশেষ অনুকূল না হওয়ায় কয়েকমাস মোকদ্দমা চলিবার পর বিহারী পরাজিত হইয়া গেলেন। অবশ্য আপীল করিতেও ক্রটী হয় নাই কিন্তু তাহাতেও কোন ফলোদয় হয় না। অতঃপর বিহারীলাল সরিয়া পড়েন এবং তাঁহার স্থলে অনিরুদ্ধদাস বাবাজীকে পূজারীরূপে নিযুক্ত করা হয়। (Criminal case No. R. M/156 of 1925, Bagerhat.)

নিবারণ দাস কর্তৃক স্বত্বের মোকদ্দমা

জমিদারপক্ষ বিহারী ব্রজবাসী দ্বারা ফৌঃ মোকদ্দমা করাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া পরে নিবারণ দাস দ্বারা এক স্বত্বের মোকদ্দমা দায়ের করাইয়া কমিটীকে বিব্রত করিবার চেষ্টা করিলেন। এ-স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে জমিদার পক্ষের পরামর্শে নিবারণ যে ফৌজদারী ও সেটেলমেণ্ট মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন। নূতন যে স্বত্বের মোকদ্দমা দায়ের করা হইল তাহার মর্ম এইরূপ—নিবারণ দাস নিত্যধামগত বালকদাস বাবাজীর পৌত্র ও একমাত্র ওয়ারেশ। বালকদাসের অপ্রকটের পর নিবারণের পিতা দীননাথ দাস গোপালের সেবা পরিচালনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নিবারণ উক্ত সেবাকার্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে তাহাকে ও তাহার মাতাকে সেবাদি করিতে থাকা কালে উপেন্দ্রনাথ কর অন্যান্য আসামীগণের সাহায্যে গোপালবাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেন। নিবারণ আর্জিতে লিখেন—"এই ঘটনার পর আমি বাগেরহাট কোর্টে ফৌজদারী মোকদ্দমা করি ও সেটেলমেণ্টে আমার নাম রেকর্ড করাইবার জন্য দরখাস্ত করি। আসামীগণ তঞ্চকতার সাহায্যে আমাকে সেই মোকদ্দমায় হারাইয়া দেয়।

বাধ্য হইয়া আমি স্বত্বের মোকদ্দমা করিয়া আমার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি।” পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন নিবারণকে সাহায্য করিতেছিলেন, কিন্তু ফৌজদারী ও সেটেলমেণ্টের মোকদ্দমা চলিবার সময় প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া অনেকেই তাহাকে আর কোন উৎসাহ বা সাহায্য দিতেন না, তবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছুসংখ্যক স্থানীয় লোক তাহাকে প্ররোচিত করিতেছিলেন। নিবারণচন্দ্র শ্রীশ্রীগোপালের সম্পত্তির ও গোপালমন্দির ও গৃহাদির যে তালিকা দেন তাহার অত্যধিক মূল্য দেখাইয়া এবং তাহার নিজের কতক সম্পত্তি গোপন করিয়া ও মূল্য কম দেখাইয়া আদালতে প্রার্থনা করেন যে, তিনি নিঃস্ব। মামলায় কোর্ট ফি দিবার ক্ষমতা নাই, একারণ পপার (Pauper) হিসাবে বিনা কোর্টফীতে আর্জি দাখিলের অনুমতি দেওয়া হউক। এইভাবে খুলনা জজ কোর্টে মামলা দায়ের করিলেন। নোটীশ পাইয়া আমরা খুলনার প্রবীণ উকীলগণের ও কলিকাতার ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া আমাদের কর্তব্য জানিয়া লইলাম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমি যখন বালকদাস বাবাজীর জীবনী সংকলনে ইচ্ছুক হইয়া নানাস্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলাম তখন চরকাটী গ্রামের এই নিবারণচন্দ্র দাস আমার একান্ত অনুগত হইয়া গোপালবাড়ীর অন্যান্য সেবকদের ন্যায় কার্যাদি করিত, অথবা তদনুরূপ ভান দেখাইত। আমি বাবাজী মহারাজের জীবনী লিখিতে থাকিলে নিবারণ আমাকে বলে যে, বাবাজী মহারাজ তাহার পিতামহের সহোদর ভ্রাতা। আমি উহার কথা অবিশ্বাস করি নাই; এবং সেইভাবেই বাবাজীর জীবনী সমাপ্ত করি। তৎপর উহা আমার পরম বন্ধু ‘হিতবাদী’র সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম.এ. বি.এল. মহাশয়ের নিকট সংশোধনের জন্য দিই। ছাপাইবার ভারও তিনি গ্রহণ করেন, ছাপাইবার

ব্যয় বহন করেন গোপাল-কমিটী। কিন্তু যিনি পুস্তক রচনা করিলেন তাহার নাম এবং যাঁহারা মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিলেন তাঁহাদের নাম পুস্তকে কোথাও উল্লেখ করেন নাই। দৌলতপুর কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র যখন যশোহর-খুলনার ইতিহাস রচনা করেন তখন তাহাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু লাউপালার প্রাচীন এই ঠাকুরবাড়ীর বা সিদ্ধমাহাত্মা বালকদাস বাবাজীর কথা তাঁহার ইতিহাসে স্থান পায় নাই। আমি তাহাতে একটু বিরক্ত হইয়াই তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলাম, "আপনার ইতিহাসে সুন্দরবনের সাপ ও বাঘের কাহিনী ও ফটো স্থান পাইল, কিন্তু স্থান হইল না খুলনা জেলার প্রসিদ্ধ তীর্থ লাউপালা ও শ্রীশ্রীগোপালের অলৌকিক কাহিনী এবং সিদ্ধ মহাত্মা বালকদাসের দিব্য জীবন-কথা।" সতীশবাবু আমাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। তিনি বলিলেন, "গোপাল সম্বন্ধে আমাকে কেহ কোন বিশেষ ইতিবৃত্ত দিতে পারে নাই বলিয়া উহা বাদ পড়িয়াছে।" পরে যখন জমিদারপক্ষ নিবারণ দাসকে বালকদাসের ওয়ারেশরূপে খাড়া করিয়া মোকদ্দমা দায়ের করিলেন তখন সত্যেন্দ্রনাথের নামযুক্ত বালকদাসের জীবনী উহারা দাখিল করিলেন। ঐ পুস্তিকায় আমার নাম ও গোপাল-কমিটির নাম না থাকায় আমাদের পক্ষের বক্তব্য বলিবার বিশেষ সুবিধাই হইল। তখন বুঝিতে পারিলাম, কেন শ্রীশ্রীগোপাল আমাদের নামগন্ধ ঐ পুস্তকে উল্লেখ না করিবার প্রেরণা সত্যেনকে দিয়াছিলেন। আমি মনে করি, গোপালের ইচ্ছাতেই সতীশবাবুর ইতিহাসেও গোপালের নামের উল্লেখ নাই। কোন সাধারণ স্বার্থবিশিষ্ট লোকের নিকটে শুনিয়া সতীশবাবু যদি গোপাল সম্বন্ধে কিছু লিখিতেন তাহা হইলে আমাদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইত। গোপালের ইচ্ছাতেই ঐরূপ হইয়াছে তাহা পরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম।

আমরা তখন এই মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় দলিল সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন কচুয়া রেজেষ্ট্রী অফিসে চরকাটি বা ঐ অঞ্চলে ৪।৫ বৎসরের মধ্যে যাহার যাহার জমি বিক্রয় হইয়াছে, ও যত দাম অফিসের খাতাপত্র হইতে তাহার টোকা লইয়া তাহার নকল লইলাম।

বাগেরহাটের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীশবাবুর নিকট শুনিলাম, যে চরকাটীর নিবারণ দাসের পিতা তাঁহাদের প্রজা ছিলেন, তখন শ্রীশবাবুর ভ্রাতা অধ্যাপক মণিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের ৭০।৮০ বৎসরের পুরাতন দলিল দেখিয়া লইবার ব্যবস্থা করিলাম। তখন ওখানকার নায়েব ছিলেন আমার অন্যতম গুরুভ্রাতা হরিনাথ দেব। হরিনাথ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় এবং তিনি গোপালের কাজে আমাকে আন্তরিক সাহায্য করিতেন। হরিনাথ তাঁহার লোক দিয়া চরকাটীর নিবারণ দাসের সম্পত্তির বিবরণ ও সেটেলমেণ্টের পরচা সংগ্রহ করিয়া দিলেন। হরিনাথকে বলিলাম, শ্রীশবাবুর বাড়ীতে গিয়া, তাঁহাদের ৭০।৮০ বৎসরের পুরাতন কাগজপত্র দেখিয়া যদি নিবারণের বা তাঁহার পূর্ব-পুরুষের কোন বৈষয়িক সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে হইবে। হরিনাথ রাজী হইলেন। আমরা দিন ধার্য করিলাম। সেদিন আমাদিগকে শুদ্ধাচারে নারায়ণের প্রসাদ দিবার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া মণিবাবু আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকালে আমরা তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা ৪।৫ বস্তা বহু পুবাতন দলিলপত্র বাহির করিয়া দিলেন। আমরা খুঁজিতে সুরু করিলাম। রাশি রাশি ধূলি ও অগণিত কীট ঘাঁটিয়া খুঁজিতে খুজিতে ৩।৪ ঘণ্টা পরে একখানা অতি পুরাতন ও অস্পষ্ট দলিল পাইলাম। সে দলিলের সব জায়গা পড়া না গেলেও মোকদ্দমার তারিখ, সাল ও নম্বর কোন রকমে পড়া গেল। তাহাতে দেখা গেল, তখনও খুলনা জেলা হয় নাই, জেলা যশোহর, খুলনা ও

বাগেরহাট দুইটী মহকুমা মাত্র। দলিলখানা আমাদের কাজে লাগিবে বুঝিলাম। ঐ কাগজের স্তূপের ভিতর কতকগুলি পরচা ও দাখিলার মুড়ি পাইলাম। তাহা আমাদের কাজে লাগিতে পারে মনে করিয়া সংগ্রহ করিলাম। হরিনাথ ঐ অঞ্চলের নায়েব ছিলেন বলিয়া নিবারণচন্দ্র দাসের যাবতীয় সম্পত্তির সন্ধান পাইতে বিশেষ অসুবিধা হইল না। কিন্তু যে অস্পষ্ট অতি প্রাচীন দলিলখানা পাইলাম, তাহার নকল লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন যুদ্ধের ভয়ে খুলনার সমস্ত রেকর্ড রাণাঘাট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা খুলনায় urgent fee দিয়া দরখাস্ত করিলাম এবং তদ্বির করিবার জন্য রাণাঘাট লোক পাঠাইলাম। কারণ, যদি একবার রিপোর্ট দেয় যে দলিল পাওয়া গেল না তখন আর কিছু করিবার থাকিবে না। যাহাকে রাণাঘাট পাঠান হইয়াছিল, তাহার চেষ্টায় মূল দলিলের খোঁজ পাওয়া গেল এবং তাহার নকলও অবিলম্বে লওয়া হইল। ঐ নকলে দেখা গেল ১৮৮৯ সালে নিবারণ দাসের পিতা দীননাথ দাস, তখন নাবালক। শরিকদের সাথে এক স্বত্বের মোকদ্দমায় তাহাদের যে বংশের পরিচয় দাখিল করিয়াছে, তাহাতে বালকদাসের নাম নাই। নিম্নে দলিলের কিছু অংশ দেওয়া গেল, তাহাতে নিবারণের মোকদ্দমার অসারতা বুঝা যাইবে ঃ—

District Jessore······

In the Court of the 1st Munsiff at Bagerhat.

27.12.1889

Suit No. 1340 of 1889 of the 2nd Court.

Suit No. 59 of 1889 of the 1st Court.

Dino Nath Das minor by his friend Ambica Bewa and others······plaintiffs.

Against

Kamal Maji and others.······Defendants.

The genealogical table as described in the plaints is given below.

* * * *

দলিলে উল্লিখিত নাবালক দীননাথ দাস হইতেছে অত্র মোকদ্দমার দরখাস্তকারী বালকদাসের ওয়ারেশ বলিয়া কথিত নিবারণচন্দ্র দাসের পিতা। মোকদ্দমায় যে বংশ-পরিচয় দাখিল করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় নিবারণের পিতামহ মোনারাম দাসের কোন ভ্রাতা নাই। কাজেই নিবারণের ঠাকুরদাদা বালকদাস বাবাজী নহেন। বাবাজী মহারাজ নিজে আকুমার ব্রহ্মচারী, বিবাহ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার নিজস্ব কোন পৌত্র থাকিবার প্রশ্নই আসে না। কাজেই নিবারণের এই স্বত্বের মামলা যে মিথ্যা ও অভিসন্ধিমূলক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা নিবারণের সম্পত্তির পরিচয় ও অনুকূল দলিলাদি দাখিল করিলাম, ও পার্শ্ববর্তী যে সব কবলা হইয়াছিল, তাহাদ্বারা নিবারণের সম্পত্তির মূল্য, নিবারণের দাখিলী সম্পত্তি ও মূল্য হইতে যে অনেক অধিক তাহা প্রমাণ করিলাম। শ্রীগোপালের সম্পত্তির মূল্য নিবারণ যাহা দিয়াছে, তদপেক্ষা যে অনেক কম, তাহাও দলিল-পত্রদ্বারা প্রমাণিত হইল।

প্রায় দুই বৎসর মোকদ্দমা চলিবার পর পপার (Pauper) মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। তৎপরে তাহাদ্বারা হাইকোর্টে আপীলও করান হইল। কিন্তু তাহাতেও তাহার কোন সুবিধা হইল না। আমরা নিবারণের যে বংশ-পরিচয় ও সম্পত্তির দলিল পাইয়াছি তাহা জানিয়া ও পপার মোকদ্দমার সাক্ষী-প্রমাণাদি দেখিয়া কোর্ট ফি খরচাদি করিয়া জমিদারপক্ষ আর স্বত্বের মোকদ্দমা করিতে সাহসী হইলেন না। কারণ ইহাতে হারিয়া গেলে কোর্ট ফী খরচও যাইবে এবং মোকদ্দমার খরচা বাবদ যে ডিগ্রী হইবে, তাহাতে জমাজমিও টান পড়িবে। এ-সব বিবেচনা

করিয়া কোর্ট ফী খরচা করিয়া নিবারণের পক্ষে আর স্বত্বের মোকদ্দমা দায়ের হয় নাই (Pauper suit No. 22 of 1928, filed dt. 10. 7. 28. in the D.J. Court, Khulna).

বিরুদ্ধ-পক্ষীয়গণের কুৎসিত উপায় উদ্ভাবন

জমিদার পক্ষ যে ব্রাহ্মণের দ্বারা বালকদাসের গুরুবংশ আখ্যা দিয়া ফৌজদারী মোকদ্দমা করাইয়াছিলেন, তাহার দ্বারা আবার আমাকে জনসাধারণের চক্ষে, বিশেষতঃ খুলনা বাগেরহাটের বিচারকদের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। উপায়টি হইতেছে—পরস্ত্রী হরণের অভিযোগ। উক্ত ব্রাহ্মণটী থানায় একটী এজেহার দিলেন,—"উপেন্দ্রনাথ কর ও জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার স্ত্রীকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। আমি দরিদ্র, আমার স্ত্রীকে উহাদের কবল হইতে রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" উহারা মতলব করিয়াছিল যে, এজেহারের পর তাহার স্ত্রীকে স্থানান্তরে সরাইয়া একটা মোকদ্দমা দায়ের করিবে। এরূপ জঘন্য ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, দুর্নামের ভয়ে আমি বাগেরহাট হইতে অন্যত্র সরিয়া যাইতে বাধ্য হইব। তাহা হইলে তাহাদের দুরভিসন্ধি সাধনের পথ নিষ্কণ্টক হইবে।

বাগেরহাট থানার দারোগা আমাকে বিশেষভাবে জানিতেন। একদিন আমাকে তিনি থানায় ডাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন—"উপেনবাবু! এই দেখুন, আপনার নামে একটী Kidnapping (নারীহরণের) অভিযোগ আছে।" এই বলিয়া হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন। আমি উত্তর দিলাম, "ভালই। তদন্ত করিয়া আপনার কর্তব্য আপনি করুন।" মন্দির-কমিটীর অন্যতম সদস্য বাগেরহাট কলেজের প্রিন্সিপাল কামাখ্যাবাবুকে এই এজাহারের কথা জানাইলাম। তিনি শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে তিনি

বাগেরহাটের S.D.O.-কে পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন—"শুনা যাইতেছে, উপেনবাবু একটী নারী সংগ্রহে বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। আমাদের পক্ষে আনন্দের কথাই বটে। কারণ উপেনবাবুর পিতা বহু চেষ্টা করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, এই ঠাকুরমহাশয় যদি তাহা করিতে পারেন, তবে সেটা আমাদের সুখের বিষয়।" সাবডিভিশনাল অফিসার আমাকে বিশেষভাবে জানিতেন। তিনি বিরুদ্ধপক্ষীয়কে এইরূপ আভাস দিলেন যে, এই ব্যাপারে আর অগ্রসর হইলে তাহারা বিষম বিপদে পড়িবেন। S.D.O.-র এই কথায় সেবারে তাহারা বিরত হইল।

ইহার পরে যাত্রাপুরের সন্নিকটবর্তী একটী ভ্রষ্টা নারীকে লোভ ও ভয় দেখাইয়া জমিদার পক্ষ আমার নামে আর একটা নারীঘটিত মোকদ্দমা দায়ের করিতে চেষ্টা করেন। উহাকে উহারা বাগেরহাটে এক মোক্তারের কাছে লইয়া যান। স্ত্রীলোকটীর কথা শুনিয়া মোক্তারবাবু বলিলেন—"উপেনবাবুকে বাগেরহাটের সকলেই জানে। এ মিথ্যা মোকদ্দমা হাকিম কখনই বিশ্বাস করিবেন না। অধিকন্তু মিথ্যা মোকদ্দমার দায়ে পড়িয়া তোমার জেল খাটিতে হইবে।" মোক্তারবাবুর এই সব কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী ভয়ে ফিরিয়া গেল।

আমরা লাউপালার শ্রীশ্রীগোপালের কার্যে আত্মনিয়োগ করা অবধি, জমিদারপক্ষ ও অন্যান্য বিরোধীপক্ষীয় ব্যক্তিগণ কমিটীর বিরুদ্ধে ও ব্যক্তিগত আমার বিরুদ্ধে নানা অসদুপায় অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে নির্যাতন করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু গোপালের অপার করুণায় সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল।

জমিদারপক্ষের আর একটী ফন্দী

জমিদারপক্ষ তাঁহাদের একজন তাঁবেদার মুসলমানকে যাত্রাপুর খালের জলকর বন্দোবস্ত দেন ও তাহার দ্বারা রথের

সময় যাহাতে মেলার নৌকাগুলি খালের দুই পার্শ্বে বাঁধিতে না পারে এ ভাবের বাধা দেন ও নানাপ্রকার গোলমাল সৃষ্টি করিতে থাকেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন এইরূপে নৌকা বাঁধা বন্ধ করিতে পারিলে, কমিটীর পক্ষে রথের মেলা মিলান অসম্ভব হইবে। এইভাবের উৎপাত আরম্ভ হইলে আমরা P.W.D.-র ক্যানাল বিভাগের একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার পরামর্শমত তাঁহার নিকট দরখাস্ত দিলাম। তিনি উহার উপর বিশেষ নোট দিয়া বাগেরহাটের এস.ডি.ও.-র নিকট পাঠাইলেন। এদিকে আমরাও ঐ ব্যাপার লইয়া শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া এস.ডি.ও.-র নিকট দরখাস্ত করিলাম। এস.ডি.ও. পুলিশ মোতায়েন করিয়া তাহাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

জমিদারপক্ষকর্তৃক যাত্রাপুর নৌকাঘাটা জমা লওয়ার ব্যাপারে বিবাদ এবং আমাকে হত্যা করার চেষ্টা

জমিদারপক্ষ পরবৎসর পুনরায় রথের মেলা ধ্বংসের আর একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ক্যানাল জমি গোপালমন্দির কমিটী P.W.D. চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার ও সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের নিকট হইতে তিন তিন বৎসরের জন্য জমা লওয়ার হুকুম পাওয়ায় তাহারা (Canal Dept.) ঐ ক্যানাল জমির মধ্যে যাত্রাপুর খেয়াঘাট-সংলগ্ন যে একটী ছোট নৌকাঘাট ছিল, তাহাও উক্ত জমাজমির অন্তর্ভুক্ত মনে করিতেন। জমিদারপক্ষ ঐ নৌকাঘাট ও খেয়াঘাট দখল করিবার সংকল্প করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা বাগেরহাটের ক্যানাল ওভারসিয়ারকে কাছারীতে আনাইয়া তাঁহাকে নানা-ভাবে আপ্যায়িত করিলেন এবং যোগসাজসে কাছারী বাড়ীতে

বসিয়া পানসীঘাটা নাম দিয়া উপরিউক্ত নৌকাঘাট সমেত খেয়াঘাট ডাকিয়া বন্দোবস্ত লইলেন। এই বন্দোবস্তটী কেবলমাত্র রথযাত্রার পূর্ব্বেই করাইয়া লইয়াছিলেন। যথাসময়ে আমরা এই ব্যাপার অবগত হইলাম এবং বুঝিলাম ইহা কার্যে পরিণত হইলে রথের মেলার প্রভূত ক্ষতি হইবে। আমরা এটী Executive Engr. কর্তৃক Confirmed হইবার পূর্ব্বেই যাহাতে নাকচ করা যায় তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তখন বরিশাল নিবাসী বসন্তকুমার বল ছিলেন যাত্রাপুর কাছারীর নায়েব। তিনি দুর্দান্ত ও হিংস্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই চাকরীর পূর্বে অন্য জমিদারের অধীন চাকরী করিবার সময় তিনি প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়া আসিয়াছিলেন। যাত্রাপুর কাছারীতে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, আমাকর্তৃক তাঁহাদের গোপালবাড়ী সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, অতএব আমাকে হত্যা করাই একমাত্র শেষ পন্থা। অনেকদিন হইতেই আমি এই ধরণের একটা কথাও শুনিয়া আসিতেছিলাম। আমার অনেক হিতৈষী বন্ধু আমাকে আশঙ্কাসহ সতর্ক করিয়া দিতেন। আমি সবসময়ই তাঁহাদের বলিতাম "আমার এ তুচ্ছ সেবা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা যদি গোপালের থাকে, তবে আমা অপেক্ষা শত শক্তিশালী ব্যক্তিও আমার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না, গোপালই রক্ষা করিবেন। আর যদি আমাকে মনে করেন তাঁহার সেবার অযোগ্য, তবে আমাকে সরাইয়া দিতে পারেন।"

যাত্রাপুর কাছারীর নায়েব P.W.D. ওভারসিয়ারের নিকট হইতে যাত্রাপুরের নৌকাঘাট ও খেয়াঘাট বন্দোবস্ত লইয়া, কনফার-মেশান (confirmation) আসিবার পূর্ব্বেই লোকজনের দ্বারা উক্ত স্থানে বিবিধ জুলুম আরম্ভ করিলেন। মেলা-সংলগ্ন নদীর উভয় পার্শ্বে মেলায়-সমাগত ব্যবসায়ীদের নৌকাগুলি বাঁধিতে দিলেন না। আমি রথযাত্রার প্রথম দিনেই বাধ্য হইয়া খুলনায়

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট গিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলাম। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি বাগেরহাট ওভারসিয়ারের নিকট পত্র দিতেছি। তিনি আসিলে তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ লইয়া ঐ ডাক নাকচ করিয়া দিব।" আমিও ক্যানাল এস-ডি-ওকে দিয়া সুপারিশ করাইয়া একখানা দরখাস্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে দিয়া আসিলাম।

সেইদিনই যাত্রাপুর কাছারীর নায়েব তাঁহার চরম অভিসন্ধি কার্যে পরিণত করিবার সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি সন্ধ্যার পর যাত্রাপুর ষ্টেশনে নামিয়া কিছু দূর লাইন ধরিয়া গিয়া যাত্রাপুর কাছারীর সম্মুখস্থ রাস্তা ধরিয়াই গোপালবাড়ীর দিকে যাইতাম। জমিদারপক্ষীয়গণ রেল লাইনের উপর এবং কাছারীর সম্মুখে সশস্ত্র গুণ্ডা মোতায়েন রাখিয়াছিলেন। এদিকে খেওয়ার পাটনী বা অন্য নৌকা যাহাতে আমাকে পার না করে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া নায়েব কাছারীর সমস্ত কর্মচারী ও অন্যান্য লোকজন সহ শ্রীশ্রীগোপালের ভোগ দিবার উদ্দেশ্যে আধমণ বাতাসা ও কীর্তনের দল সহ সন্ধ্যার পূর্বেই গোপাল বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। ঐ দিন ঐ সময়ে কাছারীর সমস্ত লোক যে গোপালবাড়ীতে কীর্তন করিবার ছলে হাজির হইলেন ইহার উদ্দেশ্য অতীব স্পষ্ট। আমি খুলনা হইতে সন্ধ্যার কিছু পরে ট্রেন হইতে যাত্রাপুর ষ্টেশনে নামিলাম। নামিয়া দেখি অদূরে লাইনের উপর ৪।৫ জন লোক লাঠি হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদের হাতে অন্য কোন অস্ত্র ছিল কি না, তাহা লক্ষ্য করি নাই। উহাদের একজন ছিল কাছারীর পেয়াদা, তাহাকে আমি চিনিতাম। হয়ত আমাকে চিনাইয়া দিবার জন্য তাহাকে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ভগবৎ ইচ্ছা ব্যতীত একটী ধূলিকণাকেও স্থানচ্যুত করিবার ক্ষমতা কাহারও হয় না। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কেহ কাহাকেও মারিতে পারে না। 'রাখে কৃষ্ণ, মারে কে'। এই

উক্তিটী লক্ষ কোটিবার জগতে প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমি যাত্রাপুর ষ্টেশনে নামিয়া ২।৪ পা অগ্রসর হইতে ৮।১০ জন লোক আমার সহিত মিলিত হইয়া নানা কথা আরম্ভ করিল। উহারা কেহ কেহ রথের মেলায়, কেহ কেহ লাউপালায় যাইবে। লাইনের উপর দিয়া যাইবার সময় কয়েকজন লাঠিধারী লোককেও দেখিলাম। কিন্তু আমি উহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু জানিও না, চিন্তাও করি নাই। লাইনের উপরের লোকছাড়াও কাছারীর রাস্তার নির্জন ও অন্ধকার স্থানে আর একটী অনুরূপদলও অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু শ্রীগোপালের জানা ছিল সবই। আমার সঙ্গীরা কাছারীর রাস্তার ধারে ধারে গেলে আমাকে বলিল "বাবু এ রাস্তাটা বড়ই অন্ধকার, সাপটাপ থাকিতেও পারে। চলুন আমরা একটু ঘুরিয়া বাজারের উপর দিয়া চলিয়া যাই।" খেয়াঘাটে আসিলে টাবুরে নৌকার মাঝিরা বলিল, "আমরা এখন পারে যাইব না।" এদিকে খেয়াটা কেবল ছাড়িয়াছে দেখিয়া পাটনীকে ডাক দিলাম। পাটনীকেও নায়েব আমাকে পার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমি ডাক দিলে সে একটু থতমত খাইয়া গেল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৌকা ফিরাইয়া আমাদিগকে পারে লইয়া গেল। গোপালবাড়ী পৌঁছিয়া দেখি, মহা সোরগোল, কাছারীর সমস্ত কর্মচারী, কীর্তনের দল, আধমণ বাতাসা। আমাকে অক্ষত-শরীরে গোপালবাড়ী পৌঁছিতে দেখিয়া হয়ত বা তাঁহারা নিজেদের চক্ষুকেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। অগত্যা তাঁহারা রাত্রি ১০টা পর্যন্ত মহাভক্তিসহকারে কীর্তনাদি করিয়া কাছারীবাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু মানুষের ভবিতব্য যাহা আছে, তাহা কেহ খণ্ডাইতে পারে না। পরদিন সকালেই অফিসের কাজের জন্য আমার বাগেরহাটে যাওয়া দরকার। আমি প্রাতে খেয়া পার হইয়া ৮টার গাড়ী ধরিবার জন্য কাছারীর সামনের রাস্তা ধরিয়া যাইতেছিলাম। সঙ্গে

আমার গুরুভ্রাতা পাইকপাড়া-নিবাসী হরিনাথ দেবও যাইতে-ছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ কাছারীর নায়েব বসন্তকুমার বল আমাকে গলায় কাপড় দিয়া টানিয়া ধরিলেন, এবং আর কয়েকজন দুর্বৃত্ত লাঠিদ্বারা প্রবলবেগে আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু দিনের বেলা, রথের সময়, চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া পড়ায় তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, আমি হত হইলাম না, আহত হইলাম। হরিনাথ ও অন্য কয়েকজন আমাকে ধরিয়া গোপালবাড়ীতে লইয়া আসিলেন। তখন যাত্রাপুর নদীর মধ্যে একটী পুলিশফাঁড়ী ছিল। কিছুক্ষণ গোপালবাড়ীতে থাকিয়া একটু সুস্থ হইয়া পুলিশফাঁড়ীতে আসিলাম। বুঝিলাম, কাছারীর নায়েব তাহাদের পূর্বেই বাধ্য করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা বলিলেন, "এখানে কিছুই করিবার নাই। আপনি বাগেরহাট যাউন।"

আমি একজন চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া বাগেরহাটে গিয়া উকীল ও মোক্তার লাইব্রেরীতে সংবাদ দিলাম। বহু উকীল ও মোক্তার আমাকে দেখিতে আসিলেন। সকলেই দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আমি একটু সুস্থ হইলে একজন এম, বি, ডাক্তার আনা হইল। তিনি আমার আঘাতজনিত ক্ষতের সার্টি-ফিকেট দিলেন। উকীলবাবুরা মোক্তারবাবুদের সহিত পরামর্শ করিয়া একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিবার আর্জি লিখিলেন। তখন বেলা প্রায় ৪টা বাজিয়াছে, S.D.O. কোর্টের কাজ সারিয়া উপরে গিয়াছেন। তখন S.D.O. ছিলেন বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। উকীল ও মোক্তারবাবুরা তাঁহাকে আমার সংবাদ পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি দ্রুতপদে নীচে আসিলেন এবং সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন এবং তখনই দরখাস্ত লইয়া নায়েব ও তাহার লোকজনের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহা কার্যকরী করিবার জন্য থানায় পুলিশের

নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমাদের সাক্ষিগণের মধ্যে রাংদিয়া পরগণার অধিবাসী ও গোপাল কমিটীর অন্যতম সভ্য রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস জমিদার মহাশয়ের প্রজারা যাহাতে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য না দেয়, তজ্জন্য উহারা নানারূপ ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীগোপালের ইচ্ছায় তাহাদের সেই সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

গোপালবাড়ীর কাজকর্মে আমার প্রতি স্বয়ং S.D.O. ও অন্যান্য কোর্টের বিচারকগণ ও বাগেরহাটের উকীল মোক্তার সকলেরই বিশেষ আস্থা দেখিয়া আমার প্রতি উঁহাদের অশ্রদ্ধা জন্মাইবার অভিপ্রায়ে একদিন মোকদ্দমা চলাকালে জমিদার পক্ষের উকীল কোর্টে S.D.O.-কে বলিলেন "হুজুর! আপনি ভাবিতেছেন যে, উপেনবাবু সাধু এবং শুধু গোপালের কাজ লইয়াই লাউপালায় যাতায়াত করেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, ভদ্র-লোকটী লাউপালাতে কেন এত যান? উনি বিবাহ করেন নাই, লাউপালায় উহার একটী রক্ষিতা আছে।" এই কথা বলিবামাত্র কোর্টে একটা ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। আশুতোষ বসু, অমৃতলাল রায়, কিরণচন্দ্র নাগ প্রভৃতি প্রবীণ উকীলগণ ও আরো অনেকে S.D.O.-কে সাক্ষী মানিয়া তখনই মানহানির মামলা করিতে উদ্যত হইলেন। আমি একটু ইতস্ততঃ করিতে থাকায় তাঁহারা বলিলেন "আপনার প্রতি যে উক্তি করা হইয়াছে, তাহাতে অপমান শুধু আপনারই নয়, আমাদের সকলেরই। কারণ, আপনি যে গোপালমন্দির কমিটীর সম্পাদক, তাহা আমাদের সকলেরই অনুমোদিত।" এই বলিয়া তাঁহারা মানহানি মোকদ্দমার মুসাবিদা পর্যন্ত প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। তখন আমি তাঁহাদের সকলকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম, "আমাকে অন্ততঃ একদিন ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ দিন"। তাহাতে তাঁহারা মত দিলেন। নিজে ভাবিয়া চিন্তিয়া পরদিন তাঁহাদিগকে বলিলাম,

"আমি একটী সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীগোপালের কাজে ব্রতী হইয়াছি। আমি গোপালের সেবায় সামান্য দান ও অধিক দানকে যেমন সমজ্ঞান করি তেমনি গোপালের সেবার জন্য কেহ আমাকে নিন্দাই করুক আর প্রশংসাই করুক তাহাও আমি সমজ্ঞান করিয়া গোপালের সেবা করিয়া যাইব। আমার কাজে যদি আমার সততা ও চরিত্র প্রমাণ না করিতে পারে, তবে কি তাহা প্রমাণ করিবে কোর্ট?" আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া উকীলবাবুরা মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করা হইতে বিরত হইলেন।

মামলা ৬ মাস ধরিয়া চলিতেছে আসামীপক্ষ বুঝিতে লাগিলেন যে, মোকদ্দমার অবস্থা ভাল নয়; তাই তাঁহারা রায়বাহাদুর শুকলাল নাগকে অনুরোধ করিলেন যাহাতে তিনি মামলাটি আপোষে মিটাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। আমার সমর্থক সকলেই আসামীপক্ষের উপর এরূপ রুষ্ট হইয়াছিলেন যে, কেহই মিটমাট করিতে সম্মত হন না। কিন্তু শুকলালবাবুর চেষ্টায় একদিন লোকালবোর্ড অফিসে এ-সম্বন্ধে একটা সভা হইল। ঐ সভায় জমিদারপক্ষে শুকলালবাবু ও জমিদারের উকীলগণ এবং আমাদের পক্ষে গোপাল-কমিটির বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ, উকীল আশুতোষ বসু ও গিরিশচন্দ্র দাশ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তখনও কাহারও ক্রোধ প্রশমিত হয় নাই এবং কেহ মিটমাটেও প্রস্তুত নহেন। সকলেই বলেন "এরূপ গুরুতর অপরাধের গুরুতর দণ্ডই প্রয়োজন।" আমার উপরও জমিদারপক্ষ হইতে বহু অনুরোধ আসিতে লাগিল। আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম; মামলায় যদি নায়েবের উপযুক্ত সাজা হয় তাহাতে গোপালের কাজের কোন সহায়তা হইবে না বরং চিরশত্রুতা চলিতে থাকিবে। এজন্য আমি উঁহাদিগকে বলিলাম যে, হিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায় না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত হিংসাতে হিংসাই বৃদ্ধি পায়। প্রেম ও ক্ষমার দ্বারা শত্রুকে

বশে আনিতে পারিলে সে চিরদিনের মত কেনা হয়ে থাকে। নায়েব ও জমিদারপক্ষীয় লোকদের শাস্তি হইলে প্রতিশোধ-গ্রহণ প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে গোপালসেবার দিক দিয়া কোন লাভই হইবে না। এইভাবে বন্ধুবর্গকে ক্রমশঃ রাজী করাইলাম। জমিদারপক্ষও পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে থাকিলে আর একদিন বার-লাইব্রেরীতে এই বিষয়ে অধিবেশন হইল। নায়েব বসন্ত বল সেখানে আমার নিকট ক্ষমা চাহিলেন এবং সর্ব-সমক্ষে অপরাধ স্বীকার করিলেন। মোকদ্দমা মিটমাটের দরখাস্ত লিখিত হইয়া S.D.O-সমীপে দাখিল করা হইল। S.D.O. উহা দেখিয়া বিস্মিত ও রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমি এ মামলা আপোষে মীমাংসা (compromise) করিতে দিব না। এ যে ধারার মামলা পক্ষদ্বয়ের ইচ্ছাতেই তাহা আপোষ-মীমাংসা (compromise) হইতে পারে না।" অনেক অনুরোধের পর S.D.O. এই মত প্রকাশ করিলেন, যে, নায়েব যদি প্রকাশ্য কোর্টে উপেনবাবুর নিকট ক্ষমাভিক্ষা করে এবং জরিমানাস্বরূপ জনহিত-কর কার্যে ৫০০৲ টাকা দেয়, তবে তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

নিরুপায় হইয়া আসামীপক্ষ তাহাতেই সম্মত হইবার পর বসন্ত বল কোর্টে সর্বসমক্ষে আমার নিকট ক্ষমা চাহিলেন এবং তাহাতে তাহাকে আমি 'ভাই' বলিয়া আলিঙ্গন করিলাম। বল মহাশয় ৫০০৲ টাকা দিলেন। তাহা হইতে S.D.O. গোপালজীউকে ২৫০৲, গোবিন্দজীউকে ১০০৲ ও বাগেরহাট কলেজকে ১৫০৲ টাকা দিয়া দিলেন। (Criminal Case No. M/57 of 1936. S.D.O. Court, Bagerhat.)

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যেদিন সকালে বসন্ত বল আমাকে মারিয়াছিলেন সেইদিন সন্ধ্যায় প্রায় একমণ বাতাসা ও অন্যান্য দ্রব্য তিনি শ্রীশ্রীগোপালের ভোগ দিবার জন্য পাঠাইয়া

দেন। কিন্তু গোপালবাড়ীতে মতিলাল দত্ত ও মহেন্দ্রনাথ গুহ প্রমুখ উপস্থিত সেবকবৃন্দ আমাকে আঘাতের জন্য এরূপ মর্মাহত হইয়াছিলেন যে, "বসন্ত বলের প্রেরিত জিনিস ভোগে লাগিবে না বলিয়া" উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। বাগেরহাট কোর্টে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিবার পর রাত্রে গোপালবাড়ীতে গিয়া আমি ঐ ব্যাপার জানিতে পারি। ভোগদ্রব্য ফেরৎ দেওয়ার জন্য উঁহাদিগকে বলিলাম,—"ইহা ঠিক হয় নাই, গোপালকে ভোগ দেওয়ার অধিকাব সকলেরই আছে, আমাকে প্রহার করিয়াছে বলিয়া কি সে-ব্যক্তি সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে? এই প্রহার আমার উপর গোপালের পরীক্ষা হইতে পারে। অতএব তোমরা বসন্তবাবুর নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলিয়া আইস যে, আমি ঐ জন্য তোমাদিগকে তিরস্কার করিয়াছি এবং তিনি যেন ভোগদ্রব্য পুনরায় পাঠাইয়া দেন।" আমার কথামত উঁহারা কাছারীতে গিয়া পুনরায় ভোগদ্রব্য পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং নায়েব মহাশয় তাহাতে আবার ভোগ দিবার দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দেন। যথারীতি ভোগদান অন্তে নায়েবকে প্রসাদ পাঠাইয়াও দেওয়া হয়। নায়েবের সহিত মোকদ্দমার মীমাংসার পর একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ঐদিনের ব্যাপারে আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে এবং আমার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন তজ্জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছেন। ইহার পর তিনি আমার ও শ্রীশ্রীগোপালের অনেক কাজ করিয়াছিলেন। ঐ মোকদ্দমায় তাঁহার শাস্তি হইতই, এবং অনেকটা আমার চেষ্টায় তিনি রক্ষা পাইয়াছেন এইরূপ তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, এজন্য আমার প্রতি তাঁহার মনে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার ভাব দেখিয়াছি এবং আর কোনদিন অন্যরূপ দেখি নাই।

যে ওভারসিয়ার ক্যানাল জমির নৌকাঘাট ও খেয়াঘাট

জমিদারকে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং যাহা নাকচ করিবার জন্য আমরা উর্দ্ধতন অফিসারের নিকট আবেদন করি, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার যে দিন ধার্য করিয়াছিলেন, সেইদিন আমরা খুলনায় তাঁহার অফিসে যাই। ওভারসিয়ারের কার্য নাকচ হইয়া গেলে জমিদারপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ও অপমানিত হইবেন মনে করিয়া জমিদারপক্ষ আমাকে হত্যা পর্যন্ত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং প্রকাশ্য দিবালোকে আমাকে প্রহারের ফলে যে ফৌজদারী মোকদ্দমার উদ্ভব হইয়াছিল তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারই অধীনস্থ একজন ওভারসিয়ার এই অবাঞ্ছিত ঘটনার মূল কারণ এই কথা বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ওভারসিয়ার মহাশয় ঐ অফিসে তখন উপস্থিত ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি উপেনবাবুর ন্যায় ... ... ব্যক্তির বিপদের মূল কারণ। আপনার দুরভিসন্ধির জন্য ঐরূপ গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে। আপনাকে সাসপেণ্ড করিব ও পরে বদলি করিব।" ইহাতে তাঁহাকে আমি ওভারসিয়ারের পক্ষে অনেক অনুরোধ করিলাম। তাঁহাকে সাসপেণ্ড করা হইল না বটে, কিন্তু তিনি মাদারীপুরে বদলী হইলেন।

ওভারসিয়ার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাটী ছিলেন কৃষ্ণভক্ত ও নামকীর্তন-পরায়ণা। তাহাকে সঙ্গে নিয়া তিনি মাদারীপুরের বিভিন্নস্থানে নামযজ্ঞে যোগদান ও কীর্তনাদি করিতেন। তিনি ঐ সব অঞ্চলের নামযজ্ঞে যাইবার জন্য আমাকে একাধিকবার অনুরোধ পত্র লিখেন, কিন্তু নানা কার্যে ব্যস্ত থাকায় আমার পক্ষে তথায় যাওয়া সম্ভব হয় না। কিছুদিন পরে ঐ কন্যাটী ইহলোক ত্যাগ করে। কন্যার প্রতি অত্যধিক মমতা থাকায় ওভারসিয়ার মহাশয় শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। কন্যার মৃত্যুর পর তাঁহার

জীবনে পরিবর্ত্তন আসে এবং ক্রমশঃ তিনি একজন পরমভক্ত হন এবং আমার সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে।

যাত্রাপুর খেয়ার পরিবর্তে পুল নির্মাণ

যাত্রাপুর ও লাউপালার মধ্যে পারাপারের জন্য খেয়া ছিল বটে, কিন্তু ঘাট ছিল না। তজ্জন্য ভাটার সময়—বিশেষতঃ বর্ষাকালে ও শীতকালে কি দারুণ অসুবিধা ছিল তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে অনুভব করিতে পারিবেন না। রথমেলার সময় যাত্রিগণের ভিড়ের চাপে খেয়াডুবি ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা—স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদের কষ্ট ও বিপদের সীমা ছিল না। তদুপরি জমিদারপক্ষ খেয়াঘাট ও নৌকাঘাট অবলম্বন করিয়া যে কত বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেন তাহা বর্ণনাতীত। একারণ শ্রীশ্রীগোপাল-সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদের ও গোপাল-দর্শনার্থী ভক্তগণের হয়রানির অন্ত ছিল না। ক্রমাগত এই ধরনের দৃশ্য দেখিয়া ও বহু ঘটনার বিবরণ শুনিয়া একদিন আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, খেয়াঘাটে পুল তৈরী করিতে পারিলেই ঐসকল দুর্ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু পুল তৈরী একা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড বা ক্যানাল বিভাগের হাত নহে। ক্যানাল বিভাগ হয়ত এখন একটি পুলনির্মাণ মঞ্জুর করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে গভর্ণমেন্টের অনুমতি প্রয়েজন; কারণ গভর্ণমেণ্ট নদীর দুইপারের জমি নিজস্ব (acquire) করিয়া লইয়াছেন। ডিঃ বোর্ড পুলনির্মাণে যদি সম্মতও হন, তবুও ক্যানাল বিভাগের অনুমতি প্রয়োজন। কিছুকাল পূর্বে ডিঃ বোর্ড বহু অর্থব্যয়ে ভুটিয়ামারীর খালের উপর বাঁধ দিয়াছিলেন, কিন্তু ক্যানাল-বিভাগ হইতে অনুমতি না নিয়া বাঁধ দেওয়ায় তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইয়াছিল। এইজন্য তৎকালীন ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আস্থা-হীনতার প্রস্তাব উত্থিত হইয়াছিল। উল্লিখিত কারণে এক

দিন ক্যানাল-বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়কে সপরিবারে গোপালবাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহাকে গোপালবাড়ী-সংক্রান্ত সকল বিষয় দেখাইলাম। ঐদিন বাগেরহাটের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগকেও আহ্বান করিয়াছিলাম। উপস্থিত সকলেই ইঞ্জিনিয়ারবাবুকে খেয়াঘাটে একটি লোহার পুলের আবশ্যকতার বিষয় বিশেষরূপে বুঝাইয়া তন্নিমিত্ত আবেদন জানাইলেন। তিনিও সপরিবারে নদী পার হইবার সময় অসুবিধাগুলি প্রত্যক্ষ করিলেন। শ্রীশ্রীগোপালদর্শন ও প্রসাদ সেবনান্তে ফিরিবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন, "আপনাদের পুল করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে যাহাতে গভর্ণমেণ্ট থেকে অনুমতি পান তাহার ব্যবস্থা আমি করিব।" উঁহার আশ্বাস-বাক্য পাইয়া আমরা বাগেরহাটের এস.ডি.ও.-কে সপরিবারে গোপালবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সকল বিষয় বুঝাইয়া বলিলাম। বিষয়টীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি পুল-নির্মাণ ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করিবার আশ্বাস দিয়া গেলেন। ইহার পর ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যানকে কয়েকজন মেম্বরসহ গোপালবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলাম। গোপালের বকুলবৃক্ষতলায় এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। চেয়ারম্যানকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইল। অভিনন্দনে সর্বসাধারণের খেয়াপারের বিপদাদির কথাও জানান হইল। তাহাতে চেয়ারম্যান ঘোষণা করিলেন যে, প্রস্তাবিত পুলের ১ অংশ ব্যয় জনসাধারণ যদি বহন করিতে পারেন, তবে ডিঃ বোর্ড অবশিষ্ট ২/৩ অংশ ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। সভায় বহু লোককর্তৃক স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র চেয়ারম্যানের হাতে দেওয়া হইল; তাহাতে তিনি উক্ত মর্মে এক মন্তব্যও লিখিয়া দিলেন। আর জনসাধারণের পক্ষে আমরা পুলের ব্যয়ের ১ অংশ দিবার প্রতিশ্রুতি দিলাম। কয়েকজনের

বাধা সত্ত্বেও ডিঃ বোর্ড কর্তৃক যাত্রাপুর-লাউপালার পুল মঞ্জুর হইয়া গেল এবং উহার অনুমতির জন্য ক্যানাল-বিভাগে দরখাস্ত পাঠান হইল।

পুলনির্মাণে বাধা

অন্যদিকে জমিদারপক্ষ তাঁহাদের তাবেদার বহুলোকের স্বাক্ষর দিয়া পুলের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট এক আপত্তিপত্র পেশ করিলেন। আপত্তির কারণ (১) অতি ক্ষুদ্র খালের উপর পুল অনাবশ্যক, (২) খেয়ানৌকা দ্বারা পারাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, (৩) পুল হইলে পাটনী বেকার হইবে ও (৪) পুলের খুটিতে কচুরীপানা বাধিয়া নৌকা চলাচলের অসুবিধা হইবে।

আমরাও ডিঃ বোর্ড ও ক্যান্যাল-বিভাগে পাল্টা দরখাস্ত দিলাম এবং তাহা S.D.O. মাধ্যমে দিয়া তাঁহার দ্বারা সুপারিশ করাইয়া পাঠান হইল। আমরা একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁহার ঊর্দ্ধতন ইঞ্জিনিয়ারবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সব বুঝাইবার পর তাঁহাদের নিকট হইতে পুল মঞ্জুরির আশ্বাস পাইলাম। যথাসময়ে ক্যান্যাল কর্তৃপক্ষ ডিঃ বোর্ডকে উক্ত পুল-নির্মাণের অনুমতি দিলেন। ইহার পর ডিঃ বোর্ড পুলের ব্যয়ের ⅙ অংশ আনুমানিক ১৩০০৲ টাকা আমানত করিবার জন্য পত্র দিলেন।

এইবারে চাঁদা-সংগ্রহে বাহির হইলাম। সঙ্গে কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু। পার্শ্ববর্তী চাপাতলা, মশিদপুর, কাইটপাড়া, রাংদিয়া, আফরা, কার্তিকদিয়া, কোধলা প্রভৃতি গ্রামের গৃহে গৃহে উপস্থিত হইলাম। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা আমানত করিতে হইবে। পৌষমাস—রাত্রি ১২টা ১টা পর্যন্ত ঘুরিয়া টাকা সংগ্রহ করি। শ্রীশ্রীগোপালের কৃপায় জনসাধারণ আমাদের হাতে পুলের

জন্য টাকা তুলিয়া দিলেন এবং তাহা যথাসময়েই জমা দেওয়া হইল। কার্য আরম্ভ হইল। রথযাত্রা-পর্বের এক সপ্তাহ পূর্বেই পুলনির্মাণ-কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বহু গণ্যমান্য লোকের উপস্থিতিতে পুলের উপর দিয়া প্রথম গমনাগমন-উৎসবও সম্পন্ন হইল। সকলের আনন্দ আর ধরে না।

নাটমন্দির

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ বাগেরহাটে S.D.O. হইয়া আসেন। আসিবার কয়েকমাস পরেই তাঁহাকে গোপালবাড়ীতে নিয়া সব দেখাই ও বলি এবং কমিটীর পূর্ব বিবরণ ও পরিকল্পনাদির বিষয় জানাই। ঐ সময়ে নাটমন্দিরের অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল—যে কোন সময় উহার ছাদ ধ্বসিয়া জীবন বিপন্ন হইতে পারে।

সুরেশবাবু গোপালবাড়ী দর্শনের কয়েকদিন পরে তাঁহার নিকট হইতে একখানি অফিসিয়াল চিঠি পাইলাম। লিখিতেছেন, —"আপনাদের পরিচালিত লাউপালা-গোপালবাড়ীর নাট-মন্দিরের ছাদের অবস্থা অত্যন্ত বিপদজনক, যে কোন মুহূর্তে ছাদ পড়িয়া লোক মারা যাইতে পারে,—অতএব আপনি অবিলম্বে উক্ত ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমাকে রিপোর্ট দিবেন।" S.D.O.র আদেশমতে ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে গিয়া বলিলাম, "আপনার হুকুমমতে ছাদ ফেলিয়া দিয়াছি, এখন উহা পুনর্নির্মাণের ভার আপনাকে নিতে হইবে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, টাকা আদায়ের সন্ধান আমাকে দিন, আমি যে কোন রকমে চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

দশানি গ্রামের নিবারণচন্দ্র দত্ত পরম বৈষ্ণব ও আমার বন্ধু। তাঁহার কন্যার বিবাহ হইয়াছিল ডিংসাইপাড়ায়। দুর্ভাগ্য-

ক্রমে কন্যাটী অকালে বিধবা হন। তিনি অতীব ভক্তিমতী। ডিংসাইপাড়া গ্রামটী গোপালবাড়ীর নিকটস্থ নদীর অপর পারে অবস্থিত। তিনি সমস্ত উৎসবাদি উপলক্ষে গোপালবাড়ীতে আসিতেন এবং তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে ওখানে আসিয়া ভোগ-রাগাদি দিতেন। একদিন তাঁহাকে নাটমন্দিরের অবস্থা জানাইয়া বলিলাম, "মা, দেখ, যদি ইহার একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে পার।" তিনি বলিলেন,—"সরইনিবাসী জমিদার কিরণচন্দ্র দাস দিগর সহিত কৈখালিতে আমাদের একটি এজমালি সম্পত্তি আছে। উহার আদায় তহশীল উঁহারাই করেন। উঁহাদের নিকট আমাদের অনেক টাকা পাওনা আছে। আপনি যদি ঐ টাকা আদায় করিয়া দিতে পারেন তবে তাহা হইতে আমি নাটমন্দির মেরামতের জন্য ৫০০০৲ (পাঁচ হাজার) টাকা দিতে পারি।" নাটমন্দিরের ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পূর্বেই তাঁহার সহিত এই কথাবার্তা হইয়াছিল। S.D.O.কে আমি উক্ত মহিলার প্রস্তাবের কথা জানাইলাম। S.D.O. বলিলেন, "আগামী রবিবার সকালে আমি কিরণবাবুকে ডাকাইব, আপনিও উপস্থিত থাকিবেন।" রবিবারে আমি S.D.O.র বাসায় গেলাম, কিরণবাবুও আসিলেন। S.D.O. কিরণবাবুকে বৈষয়িক দিক দিয়া বিশেষভাবে চাপ দিলেন এবং প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার কঠোর ব্যবহারের কথাও তুলিলেন। পরে বলিলেন, "আপনি পুত্রকন্যাহীন এক বিধবার টাকা পর্যন্ত আটক রাখিয়াছেন। একটি মহৎ কার্যের জন্য তাঁহার ৫০০০৲ টাকা ব্যয় করিবার ইচ্ছা, এবং সেই কার্যের মধ্যে আমরাও জড়িত; কিন্তু আপনি টাকাগুলি না দিলে ঐ কার্যটী সম্পন্ন হইতেছে না।" কিরণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সৎকার্যে তাহার এই টাকা দান করিবার ইচ্ছা?" S.D.O. তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। কিরণবাবু উত্তর করিলেন, "বেশ, মহিলাটীর সম্মতিপত্র পাইলে আপনার হাতেই টাকা দিয়া দিব।"

কিরণবাবু চলিয়া গেলে S.D.O. আমাকে সম্মতিপত্র আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন।

তখন নিবারণবাবুর সহিত দেখা করিয়া জানিতে পারিলাম যে তাঁহার কন্যা বায়ু পরিবর্তনের জন্য ভুবনেশ্বরে গিয়াছেন এবং কিছুদিন পরে নিবারণবাবুও তথায় যাইবেন। নিবারণবাবুর সহিত ভুবনেশ্বর যাইতে পারিলে সম্মতিপত্র আনিবার পক্ষে খুবই সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া আমি ছুটী লইয়া নিবারণবাবুর সহিত ভুবনেশ্বরে গেলাম। কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া ভদ্রমহিলাকে S.D.O. ও কিরণবাবুর মধ্যে আলাপ-আলোচনার কথা জানাইয়া সম্মতিপত্র লিখিয়া দিতে বলিলাম। তিনি কিরণবাবুর বরাবরে সম্মতিপত্র লিখিয়া দিলেন।

সম্মতিপত্রসহ দেশে ফিরিয়াই এস.ডি.ও.-র সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দেখিয়াই দোতালার বাসা হইতে বলিয়া উঠিলেন, "উপেনবাবু, গোপালজীউ আমার সেবা গ্রহণ করিলেন না।" আমি উপরে উঠিয়া তাঁহার কাছে গেলে তিনি বলিলেন যে, ২৪ পরগণা জেলার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া তাঁহাকে টেলিগ্রাফে বদলী করিয়াছে। টেলিগ্রামখানাও দেখাইলেন। জানিলাম তাঁহার বিদায় অভিনন্দনাদিও হইয়া গিয়াছে, বিছানাপত্র বাধা-সারা, পরদিনই রওয়ানা হইতেছেন। আমি সম্মতিপত্র প্রাপ্তির কথা বলিলে এস.ডি.ও. উত্তর দিলেন, "আমি এখন setting sun, এখন আমার পক্ষে কিরণবাবুর কাছ থেকে ঐ টাকা আদায় করা অসম্ভব।" এস.ডি.ও. গোপাল-বাড়ীর পরিদর্শন বহিতে লিখিয়া গেলেন, "শ্রীশ্রীগোপালজীউর সেবাকল্পে কিছু করিবার একান্ত অভিপ্রায় আমার ছিল, কিন্তু বদলীর অর্ডার হওয়ায় আমি কিছু করিতে পারিলাম না। আমার স্থলাভিষিক্ত মহকুমা অফিসার আমার অপূর্ণ কার্যের ভার গ্রহণ করিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। গোপালের কাজ গোপালই

করিবেন। শ্রীযুত ত্রৈলোক্যবাবু ও শ্রীযুত উপেনবাবু নিঃস্বার্থভাবে গোপালসেবার কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের নিঃস্বার্থসেবা কখনই ব্যর্থ হইবে না।”

এত করিয়া সম্মতিপত্র আনিয়াও তদ্দ্বারা কিছু হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া মনে হইল—ঐ টাকা গ্রহণের ইচ্ছা গোপালের নাই।

রসিকলাল হুই পূর্বে ছিলেন ডিঃ বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার। পরে P.W.D.-এর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি কাশীবাসী একজন শ্রীসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ভজনাদি করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন আদর্শচরিত্র ব্যক্তি। একদিন তাঁহাকে গোপালবাড়ীতে গোপালের সকল বিষয় ও কাজকর্ম দেখাইলাম। দেখিয়া শুনিয়া নীরবে বারান্দায় ঘণ্টাখানেক বসিয়া রহিলেন। পরে আমাকে বলিলেন যে, এখানে আজিও মহাপুরুষের প্রভাব আছে এবং এইরূপ তিনি রঙ্গনাথের মন্দিরে অনুভব করিয়াছিলেন। নাটমন্দিরের অবস্থা দেখাইলে তিনি বলিলেন, “আপনি ইট কাটাইয়া ফেলুন, গোপালের ইচ্ছা হইলে পরের কাজটুকু সম্পন্ন হইতে পারে।”

এইসময়ে আমার গুরুভ্রাতা দৈবজ্ঞহাটীনিবাসী অক্লান্তকর্মী মহেন্দ্রনাথ গুহ গোপালবাড়ীর সকল বিষয় দেখাশুনার ভার লইয়া কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া নদীতীরে গোপালের জমিতে ইট কাটিবার ব্যবস্থা করিলাম; কিন্তু ঐ কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার কোন সংস্থান ছিল না।

গোপালবাড়ীর নিকটে সুদেবী মাতাজী নামে এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবী এক জীর্ণ কুটীরে বাস করিতেন। ভিক্ষাই ছিল তাঁহার জীবিকা। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যদ্বারা জীবন রক্ষা করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইত তাহার দ্বারা উৎসবাদি করিতেন। ইট প্রস্তুতের কাজ

আরম্ভ হইয়াছে—এমন সময় মাতাজী একদিন "বাবা, গোপালের সেবার জন্ম আমি সামান্য কিছু দিতে চাই" বলিয়া আমাকে তাঁহার কুটীরের ভিতর নিয়া গেলেন এবং কুটীরের পিছন দিক হইতে মাটী খুঁড়িয়া দুইটী মাটীর হাড়ী বাহির করিলেন। উহার মধ্যে তাঁহার সারাজীবনের সঞ্চয়। গণিয়া দেখি পাঁচশত। টাকাগুলি বিবর্ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু খাঁটী রূপার টাকা। একটি টাকাও নিজের জন্ম না রাখিয়া মাতাজী সবটাই আমাকে ধরিয়া দিলেন। ভিখারিণীর সারাজীবনের সঞ্চয় মুহূর্ত মধ্যে অকাতরে দেবোদ্দেশ্যে দান করিতে দেখিয়া আমি আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম; ভাবিলাম—প্রাসাদবাসী জমিদার, ২৫টী টাকার জন্ম যাঁহার কাছে ২৫ বার যাইতে হয়—তিনি ধনী, না এই বৃদ্ধা ভিখারিণী ধনী? 'ধনী' শব্দটীর প্রকৃত সংজ্ঞা কি? সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রয়াগে ত্রিবেণীসঙ্গমে প্রতি ৫ বৎসর অন্তর মহামোক্ষ পরিষদ অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার রাজকোষের শেষ কপর্দক পর্যন্ত দান করিয়া দিতেন। বড় দানই বটে, কিন্তু পরদিন হইতেই রাজ-কোষে জলস্রোতের ন্যায় অর্থ আসিয়া জমা হইত। কিন্তু এই বৃদ্ধা ভিখারিণীর কোষ আর কোনদিনই পূর্ণ হইবে না। মনে প্রশ্ন জাগে—কাহার হৃদয় মহত্তর। আর ইতিহাস? সেত রাজরাজড়াদের জন্যই। কত যে দরিদ্র অজ্ঞাত অখ্যাত উদার ও মহৎ প্রাণের পরিচয় হইতে মানুষ বঞ্চিত তাহার ইয়ত্তা নাই।

ঐ ৫০০৲ টাকা পাইয়া দুই লক্ষ ইট প্রস্তুতের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলাম। ক্রমে ইট কাটা শেষ হইল বটে, কিন্তু রসিকবাবু ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। রসিকবাবুর চারিটী পুত্র। সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত এবং সক্ষম। অধ্যক্ষ কামাখ্যাবাবু, ওভারসিয়ার অমৃতলাল মিত্র ও উকীল আশুবাবু—এই তিন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের সহিত কলিকাতায় দেখা করিলাম। একজনের ইচ্ছা ছিল পিতৃস্মৃতি বজায় রাখার

নিমিত্ত কোনও সৎকার্যে কিছু দান করা ; কিন্তু অপর তিন জনের আগ্রহের অভাবে তাহা আর কার্যে পরিণত হইল না। সৌভাগ্য না থাকিলে ধনীর ধন সৎকার্যে ব্যয়িত হয় না।

খুলনার বিখ্যাত কণ্ট্রাক্টর রমাকান্ত মিত্র মহাশয়ের পুত্র হৃষিকেশ মিত্র বেশ বিত্তশালী লোক। নাটমন্দিরের সংস্কার উদ্দেশ্যে একখানা স্মারকলিপি নিয়া অধ্যক্ষ কামাখ্যাবাবু, উকীল আশুবাবু, ত্রৈলোক্যবাবু ও আমি উঁহার কলিকাতার বাসভবনে সাক্ষাৎ করি। মানসার খাল কাটিয়া রমানাথবাবুর প্রথম অর্থবান হওয়ার সুযোগ ঘটে এবং হৃষিকেশবাবুরা এই নদীর কূলেই বাস করেন। অতএব এই নদীর তীরে অবস্থিত শ্রীপাট লাউপালার শ্রীশ্রীগোপালজীউর মন্দিরাদির সংস্কারকার্যে রমানাথবাবুর স্মৃতি রক্ষা করেন—ইহাই ছিল হৃষিকেশবাবুর কাছে বক্তব্য। হৃষিকেশ বাবুর মধ্যম ভ্রাতা বাসাবাড়ীর রায়বাহাদুর শুকলাল নাগ মহাশয়ের জামাতা, অন্য ভ্রাতা ব্যোমকেশবাবু আমার সহপাঠী এবং অন্যান্য সূত্রে এই মিত্র পরিবারের সহিত নানাভাবে আমাদের যোগাযোগ ছিল। হৃষিকেশবাবু মিষ্টভাষী, তিনি আমাদিগকে কিছু সাহায্য করিবার আশা দিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে কিছুই করিলেন না। ইহার পর রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাগেরহাটে S.D.O. হইয়া আসেন। তিনি বিশেষ ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহাকে গোপালবাড়ীতে নিয়া সব দেখাইয়াছিলাম। রথযাত্রার সময়েও তিনি ওখানে গিয়াছিলেন এবং নাটমন্দিরের অভাবে যাত্রীসাধারণের অসুবিধা দেখিয়া উহা পুনর্নির্মাণ বিষয়ে আগ্রহান্বিত হইলেন।

বাঙ্গলার সুবিখ্যাত রাণী রাসমণির ওয়ারেশ রাণী সিন্ধুবালার খুলনা জেলায় মোল্লাহাট থানার অন্তর্গত মকিমপুর পরগণার জমিদারী ছিল। রাজনৈতিক কোন কারণে সরকার ইঁহাদের ১৪টী বন্দুক বাজেয়াপ্ত করেন। বন্দুকের অভাবে আদায়ী টাকার

নিরাপত্তা রক্ষাদির অসুবিধা হওয়ায় বন্দুকগুলি ফেরত পাইবার জন্য জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও সরকার বাহাদুরকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে ইঁহারা S.D.O.কে বিশেষ ধরাধরি করিতে লাগিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, গোপালবাড়ীর নাটমন্দির তৈরীর জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিলে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারেন। জমিদার পক্ষের কর্মচারিগণ তাহা স্বীকার করিয়া ঐ টাকা নগদ দিতে চাহিয়াছিলেন। S.D.O. অগ্রিম টাকা না নিয়া শুধু প্রতিশ্রুতি চাহিলেন। রেবতীবাবুর বিশেষ চেষ্টায় বন্দুকগুলি ফেরতের হুকুম হইয়া গেল। তখন রেবতীবাবু আমাকে তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় গিয়া টাকা আনার কথা বলিলেন। সিন্ধুবালা এষ্টেটের উকিল রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবতীবাবু ও আমি কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। কিন্তু রমানাথবাবু বলিয়াছিলেন যে, রাণী সিন্ধুবালার টাকা গোপাল গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। রাণীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। রাণী বলিলেন, "ম্যানেজারবাবু এখানে নাই, আসিলেন ব্যবস্থা করিব।" তাহার পর টালবাহানা চলিতে লাগিল। অবশেষে রমানাথবাবুর ভবিষ্যৎ-বাণী ফলিয়া গেল। এক কপর্দকও মিলিল না। মকিমপুরের নায়েবকে রেবতীবাবু তিরস্কার ও ভীতিপ্রদর্শন করিতে ছাড়িলেন না,—কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল।

অতঃপর বাগেরহাট অঞ্চলে এক ন্যাংটা সাধুবাবা আসিলেন। তিনি পূর্বে নাকি সাবজজ ছিলেন—অর্থাদি স্পর্শ করিতেন না। যাঁহারা তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন তাঁহাদের বাড়ীতে তিনি শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ করাইতেন। তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি একদিন বলিলেন, "উপেন্দ্রনাথ, গোপালের নাটমন্দিরখানা শেষ করে ফেল।" আমি উত্তর দিলাম—"আমরা চেষ্টার ক্রটী করিতেছি না, কিন্তু কোনরূপ সুবিধা করিতে পারিতেছি না।"—আমার

এই জবাব শুনিয়া বলিলেন যে, টাকা তিনি যোগাড় করিয়া দিবেন।

সাধুজী ছিলেন নির্ভীক ও তেজস্বী। তিনি নানাস্থানে ঘুরিয়া টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নিজে টাকা না নিয়া বলিতেন, "উপেনকে দিও।" খুলনার জুয়েলার্স দত্ত ব্রাদার্সের সতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর সাধুজী নাটমন্দির নির্মাণ করিবার ভার দিলেন। তাঁহার আদেশে সতীশবাবু গোপাল-বাড়ীতে থাকিয়া কাজ করাইতে লাগিলেন। সাধুজীর নির্দেশমতে আমরা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে গিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। পূর্ব-তৈরী ইটের কিছু বিক্রয় করিয়াও কিছু টাকা হইল। বড় বড় আশার পিছনে বহুদিন ছুটাছুটি করিবার পর ওই ন্যাংটা বাবার প্রেরণায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণের সাহায্যে বহু-প্রত্যাশিত নাট-মন্দির পুনর্নির্মিত হইল।

ঐ সব কাজের মধ্য দিয়া দুইটি শিক্ষালাভ করিয়াছি। প্রথমটী—আমরা যন্ত্রমাত্র, যন্ত্রী শ্রীভগবান; আর অপরটী—ভাগ্যবান না হইলে তাহার অর্থ ভগবৎ-সেবায় লাগে না।

ভগীরথ সেন মহাশয়ের রিপোর্ট

From Babu Bhagirath Sen,
President, Bahirdia-Mansa Union Board.

To

The S.D.O., Bagerhat
Dated, Mansa, the 13th April, 1925.

Sir,

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারানুযায়ী লাউপালানিবাসী রামলাল অধিকারী বাবু উপেন্দ্রনাথ কর ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে যে আর্জি দায়ের করেন তৎসম্বন্ধে আপনার গত মাসের ২০শে

তারিখের আদেশ অনুযায়ী আমি এই রিপোর্ট দাখিল করিতেছি। আমি স্থানীয় তদন্ত করিয়া উভয়পক্ষের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু নিম্নলিখিত ঘটনাবলীর জন্য উহা সম্ভব হয় নাই।

ফরিয়াদির অভিযোগ এই যে, তিনি এবং তাহার পূর্বপুরুষগণ তাহাদের শিষ্য গোপালমন্দিরের মোহান্ত বল্লভদাসের সময় হইতে অষ্টমদোল উৎসব করিয়া আসিতেছেন। বর্তমান বৎসরে তিনি উক্ত অষ্টমদোল অনুষ্ঠান করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে ৬০০।৭০০ লোকের ভোজের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন কিন্তু আসামী বলপূর্বক ও বেআইনীভাবে কতকগুলি লোক সঙ্গে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করে এবং তাহাকে ঐ কার্যে বাধা দেয় এবং সমস্ত আয়োজিত খাদ্যবস্তু নষ্ট করিয়া দেয়। আমি মনে করি, এই অভিযোগ মিথ্যা এবং প্রকৃত অবস্থার বিরোধী। ফরিয়াদী অবশ্য অনেকগুলি সাক্ষী হাজির করিয়া তাহার অভিযোগ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সাক্ষীদের বিবৃতিগুলি এত স্ববিরোধী উক্তিতে পরিপূর্ণ যে তাহার উপর কোন আস্থা করা চলে না। বহুসংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তির সাক্ষ্যে ইহা জানা যায় যে, ফরিয়াদীর পূর্বপুরুষ রামকিশোর অধিকারী মৃত বল্লভদাসের গুরু ছিলেন না এবং বল্লভদাসের পারিবারিক গুরু ছিলেন হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্যামসুন্দরপুর গ্রামনিবাসী জনৈক গোস্বামী। পরে নকুল ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে বল্লভদাস বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হয়েন, এবং তাঁহার পরিবার ও স্বজাতিবর্গের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। উক্ত নকুল ব্রহ্মচারীই লাউপালার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার প্রস্থানের পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য বল্লভদাস মোহান্ত পদ লাভ করিয়া সেবাকার্য চালাইতে থাকেন। এই বল্লভদাস মোহান্তই বর্তমান শ্রীশ্রীগোপালের মন্দির ও অন্যান্য ইমারৎ স্থাপন করেন এবং শ্রীশ্রীগোপালের নামে বহু দেবোত্তর

সম্পত্তি সংগ্রহ করেন। বল্লভদাসের জীবদ্দশায় অষ্টমদোল অনুষ্ঠান চালু ছিল না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণিমা তিথিতেই দোলযাত্রা উৎসবের বিধান আছে, এবং উহাকে প্রথম দোল বলা হয় এবং এই প্রথম দোলই গোপালমন্দিরে প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। অষ্টমী তিথিতে মোহান্ত বল্লভদাস ইহলোক ত্যাগ করেন। তৎপর তাঁহার শিষ্য গোবিন্দদাস মোহান্ত হয়েন। তিনি স্বীয় গুরুর নির্বাণতিথি উপলক্ষে পূর্ণিমার দোল ছাড়াও অষ্টমদোল উৎসব করিতেন। তদবধি গোপালজীউর মন্দিরে অষ্টমদোল উৎসবও হইয়া আসিতেছে। যে কমিটী বর্তমানে গোপালজীউর সেবাদি কার্যের ব্যবস্থাদি করিতেছেন তাহাদের পরিচালনায় এ বৎসরও অনুরূপভাবে অষ্টমদোল উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

আসামীগণ উক্ত কমিটীর সভ্যবৃন্দ। ১নং আসামী কমিটীর সম্পাদক ও ২নং আসামী কমিটীর সভাপতি। এই ব্যাপারে ফরিদায়ীর কোন সম্পর্ক নাই।

ইহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই কমিটী গঠিত হওয়ার পূর্বে গোপালজীউর সেবাকার্য ও তদীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান কার্য যাত্রাপুর কাছারীর কর্মচারীদের হস্তে ছিল। কমিটী গঠিত হওয়া অবধি কাছারীর নায়েব ইহাকে ধ্বংস করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং তদুদ্দেশ্যে বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। এক উপায়ে বিফল হইয়া তিনি উপায়ান্তর অবলম্বন করিতেছেন। বর্তমান মোকদ্দমাটী তাঁহারই ষড়যন্ত্রের ফল,—আসামীপক্ষ ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন। ফরিয়াদী গোপালবাড়ীতে একটী সভা আহ্বান করেন। উহাতে তিনি স্বজাতীয় বহু ব্যক্তি ও অন্যান্য ২।৪ জন ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ করেন। বর্তমান কমিটীর কার্যকলাপ মিথ্যারূপে নিন্দা করাই ছিল ঐ সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য। ঐ সভা আহ্বানের জন্য ফরিয়াদী কমিটীর কোন অনুমতি গ্রহণ করেন নাই, এবং

তজ্জন্যই আসামীগণ সভার অধিবেশনে বাধা দিয়াছিলেন এবং যেহেতু উহা দ্বারা শান্তিভঙ্গের বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল তজ্জন্য তাঁহারা ব্যাপারটী পুলিশের গোচরীভূত করেন। ফরিয়াদীর যে অভিযোগ যে তিনি অষ্টমদোল উৎসব ও ৬৷৭ শত লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইহাও সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাহার ঐরূপ ব্যবস্থা করার কোন প্রশ্নই ছিল না। পক্ষান্তরে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে ফরিয়াদি কর্তৃক আহূত প্রসাদ-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে কমিটীই প্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন এবং যাহারা সভা করিতে না পারিয়া অপমানিত বোধ করেন তাহারাই প্রসাদ উপেক্ষা করিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন।

আপনার নিকট প্রকৃত পরিস্থিতি জ্ঞাপনার্থে আমি যে সকল বিষয় উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা জানান আমার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

লাউপালা মন্দিরের শেষ মোহান্ত ছিলেন সখিচরণ মোহান্ত। নকুল ব্রহ্মচারীর সময় হইতে সখিচরণ মোহান্তের গোপালবাড়ী ত্যাগ পর্যন্ত গোপালের সেবা ও তদীয় সম্পত্তির তত্বাবধান সুষ্ঠু-ভাবেই চলিতেছিল, কিন্তু সখিচরণের প্রস্থানের পর গোবরডাঙ্গার জমিদারদের অধীন যাত্রাপুর কাছারীর কর্মচারীবৃন্দ গোপালমন্দিরের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে নানাবিধ অব্যবস্থা সুরু হইতে থাকে। ইহাতে শুধু স্থানীয় হিন্দুসম্প্রদায় বা বৈষ্ণব সম্প্রদায় নহে, প্রায় সমগ্র বাঙ্গলার হিন্দু জনসাধারণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েন এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটী তদানিন্তন বাগেরহাটের মহকুমা অফিসার শ্রীযুত সুকুমার চ্যাটার্জীর গোচরীভূত করা হয়। তিনি জনসাধারণের অনুরোধে গোপালের সেবাকার্য ও তদীয় সম্পত্তির পরিচালনার জন্য একটি কমিটী গঠন করেন। তিনি নিজেই ঐ কমিটীর সভাপতি ছিলেন, সম্পাদক ছিলেন বাগের-হাটের সাবডেপুটী এবং যাত্রাপুর কাছারীর নায়েব বাবু ধরণীধর

ঘোষ ছিলেন সহঃ-সম্পাদক। কমিটীর কাজ ভালভাবেই চলিতে লাগিল। যখন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস এস-ডি-ও হইয়া আসেন, তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া কমিটীতে সামান্ত কিছু রদবদল করা হয়—ধার্মিক-প্রবর ও মাননীয় শ্রীযুত ত্রৈলোক্য নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার সুচারু পরিচালনায় কমিটির কার্য ভালভাবেই চলিতেছে এবং জন-সাধারণ কমিটির কার্যে সম্পূর্ণ আস্থাবান আছেন এবং সরকারী ঊর্ধ্বতন কর্মচারিগণও কমিটীর কার্যকারিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের পরিদর্শন-মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ইহাও প্রমাণিত হয় যে নায়েব ধরণীধর ঘোষের মৃত্যুর পর বর্তমান নায়েব সুরেন্দ্রনাথ ঘোষকে স্থলাভিষিক্ত হইতে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করার পরিবর্তে কমিটী-কেই বাতিল করিয়া দিতে সচেষ্ট হন। তিনি প্রথমেই এই যুক্তি উঠাইলেন যে, যাত্রাপুরের জমিদারগণই শ্রীশ্রীগোপালের যাবতীয় সম্পত্তির আইনসঙ্গত মালিক এবং গোপালের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান তাঁহারই হাতে আসা উচিত। ফলে কয়েকটী মোকদ্দমার সৃষ্টি—দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়দিকেই। দেওয়ানীতে নিম্ন আদালতে কমিটীর পক্ষে রায় দেওয়া হয়, কিন্তু বর্তমানে হাইকোর্টে উহার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে। নায়েব সুরেন্দ্রবাবু ঐ সব মামলায় অকৃতকার্য হইয়া অন্য একটি ফন্দী অবলম্বন করিয়াছিলেন। উহার মর্ম এই—গোপালবাড়ীর শেষ মোহান্ত সখিচরণ সীতানাথ চক্রবর্তী নামীয় এক ব্যক্তির স্বপক্ষে একটি উইল দলিল সম্পাদন করিয়াছেন এবং সীতানাথ এই মর্মে একটি কবুলিয়ৎ সম্পাদন করিয়াছে যে গোপালজীউর সেবা ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান অতঃপর যাত্রাপুর কাছারীর হস্তে ন্যস্ত হইল এবং এই অভিপ্রায়ে উক্ত সীতানাথ জজকোর্টে উক্ত দলিলের প্রোবেটের জন্য এক দরখাস্ত

দায়ের করিয়াছেন। ইহা ছাড়া হাইকোর্টে আপীল দায়ের করার কথা পঞ্চম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আসামীপক্ষ মৌখিক ও দলিলগত সাক্ষ্য দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর লাউপালায় একটা মেলা বসান হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা গোপালজীউর প্রভূত আয়ও হইয়া থাকে। গত বৎসর কাছারীর নায়েব সুরেন্দ্রবাবু যাত্রাপুর বাজারে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী মেলা বসান এবং গোপালজীউর প্রাপ্য আয় নিজে লওয়ার অভিসন্ধি করেন। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় পুলিশ কর্তৃপক্ষ বাগেরহাটের এস-ডি-ওর নিকট এই মর্মে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন যে, যাত্রাপুরে ১৪৪ ধারা জারি করা কর্তব্য। এস-ডি-ও ১৪৪ ধারা জারীর আদেশ দেন। নায়েব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেন, কিন্তু উহা নাকচ হইয়া যায়।

ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুরেন্দ্রবাবুর পরামর্শে নিবারণ চন্দ্র দাস নামক জনৈক ব্যক্তি বল্লভদাসের উত্তরাধিকারী বলিয়া দাঁড়ান এবং তৎসূত্রে গোপালজীউর সমস্ত সম্পত্তির উপর দাবী করেন এবং সেটেলমেণ্ট অফিসারদের নিকট গোপালজীউর সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব রেকর্ড করিবার দাবী জানান। কিন্তু তাহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। অতঃপর কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত বর্তমান পূজারী গোপালবাড়ীর মোহান্তরূপে নাম লিখাইবার জন্য সেটেল-মেণ্ট কর্মচারীদের নিকট হাজির হন, কিন্তু তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন শুধু গোপালের সেবাপূজা কার্যের জন্য। তাঁহার এই অপচেষ্টাও বিফল হয়। আমি এই পূজারীকে জেরা করিয়াছি এবং তাঁহার উক্তি হইতে আমি ইহা বিশ্বাস করিয়াছি যে, তিনিও ফরিয়াদী পক্ষে যোগ দিয়াছেন এবং যাহারা কমিটীর ধ্বংসকামী তিনি তাহাদের মধ্যেই অন্যতম। এইভাবে কমিটীকে হয়রাণী করা হইতেছে। কাছারীর নায়েব এক উপায়ে ব্যর্থ হইলে অন্য উপায়

উদ্ভাবন করিতেছেন। যেহেতু গোপালমন্দির কমিটী গঠনের দ্বারা যাত্রাপুর কাছারীর মর্যাদা ও উপার্জন ব্যাহত হইতেছে, আপোষ মীমাংসার আশা করা বৃথা। এই ব্যাপারে শেষ পরিণতি যে কোথায়, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ফরিয়াদী আমার নিকট স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কমিটীর রদবদল না হইলে তিনি কোনও আপোষ-মীমাংসায় আসিতে রাজী নহেন।*

বশংবদ

(স্বাঃ) ভগীরথ সেন, প্রেসিডেণ্ট

শ্রীশ্রীগোপালবাড়ীতে আশ্রম, টোল ও তৎসংলগ্ন আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধ প্রস্তুত জন্য গাছ-গাছড়ার উদ্যান

ইতিপূর্বে আশ্রমের উল্লেখ আছে মাত্র, এক্ষণে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

আশ্রমে একটী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, পরে তৎসংলগ্ন একটি টোল স্থাপনের কথাও চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম যে, রাংদিয়া স্কুলের পার্শ্বে রায়সাহেব হরবিত্ত দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় যে টোল স্থাপিত হইয়াছে তাহা গোপালবাড়ীর অতি নিকট, সেইহেতু গোপাল-বাড়ীতে আর একটী টোল স্থাপিত হইলে কোনটিই ভালভাবে চলিবে না এবং এত নিকটে টোলের জন্য সরকারী সাহায্যও পাওয়া যাইবে না; তবে রাংদিয়ার টোল গোপালবাড়ীতে স্থানান্তর করিতে পারিলে সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া হরবিতবাবুর সহিত একদিন আলাপ করিলাম। আমাকে টোলের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত দেখিয়া তিনি আমাকে টোল কমিটীর সভ্য করিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণ রাংদিয়ার পণ্ডিতপ্রবর

* ইংরেজী রিপোর্টের অনুবাদ। মূলরিপোর্টের সইমোহরী নকল আছে।

দ্বারিকনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ ছিলেন টোলের অধ্যাপক। ইনি বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ও তেজস্বী ছিলেন। ইনি প্রথম জীবনে গভঃ স্কুলের হেডপণ্ডিত ও পরে স্কুল-সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন। চাকরী হইতে অবসর গ্রহণের পর এই টোলের কাজ গ্রহণ করেন। আমার পাঠ্যজীবনে ইনি আমার অধ্যাপক ছিলেন। শারীরিক অপটুতার জন্য ইনি মহাদেব কাব্যতীর্থ মহাশয়কে টোলের ভার দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনিও কিছুদিন পরে পণ্ডিতপ্রবর তারাপ্রসন্ন তর্কতীর্থ মহাশয়ের উপর টোলের ভার দিয়া অবসর লয়েন। তর্কতীর্থ মহাশয় মূলঘর হইতে যাতায়াত করিতেন। তজ্জন্য টোল-কমিটীকে প্রস্তাব দিই যে, গোপালবাড়ীতে টোল স্থানান্তরিত করিলে আমরা সেখানেই অধ্যাপক ও কয়েকজন ছাত্রের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। কমিটী আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। আমরা টোল-গৃহ নির্মাণ বিষয়ে চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে চাঁপাতলানিবাসী যোগেন্দ্রনাথ হালদার নামক এক উদার প্রকৃতির ভদ্রলোক উহা তৈরী করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। গোপালসেবক মহেন্দ্রনাথ গুহের অক্লান্ত পরিশ্রমে টোলগৃহ নির্মিত হইল এবং রাংদিয়ার টোল গোপালবাড়ীতে স্থানান্তরিত হইল। কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপকের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা গোপালবাড়ীতেই করা হইল।

শ্রীশ্রীগোপালবাড়ীতে টোল স্থাপন ও তাহাতে কাব্য, ব্যাকরণ ও দর্শন শাস্ত্রাদি পাঠের পর শ্রীভগবৎকথা প্রচার করিয়া দেশবাসীকে ভগবদুন্মুখ করিবার চেষ্টা করার আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রথম হইতেই ছিল। বাল্যবন্ধু সরলপ্রাণ তর্কতীর্থ মহাশয় কিছুদিন অধ্যাপনা করিবার পর শিববাড়ী টোলে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান। তখন আমার শ্রীগুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের

নিকট তাঁহার ছাত্র হুগলী জেলার জিরাট-বালাগড় নিবাসী শ্রীযুত গৌরগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের খোঁজ পাইয়া অমৃত লাল মিত্র ও আমি যাইয়া তাঁহাকে নিয়া আসিলাম। কিছুদিন কাজ করিয়া তিনিও চলিয়া গেলেন। তৎপর প্রভুপাদের অন্যতম শিষ্য ননীগোপাল গোস্বামী মহাশয়কে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করা হয়। কয়েকমাস কাজ করিয়া তিনিও চলিয়া যান।

অতঃপর শ্রীল রামদাসবাবাজী মহারাজের সাহায্যে তাঁহার শিষ্য বাঁকুড়া নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ, ভাগবতশাস্ত্রী মহাশয়কে আনা হইল। তিনি সপরিবারে আসিলেন। অধ্যাপক মহাশয়ের দ্বারা নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করা হইল। বর্তমান শ্রীল রামদাসবাবাজী সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা ভাগবত-ব্যাখ্যাতা কেদার চন্দ্র রায় গোপালবাড়ীর টোলের ছাত্র। পরে তিনি ঐ টোলের অধ্যাপক পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনিও ঐরূপ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন।

আমাদের ইচ্ছা ছিল, আশ্রমের ছাত্রদের মধ্যে যাহারা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাহাদের জন্য তদুপযোগী ব্যবস্থা করা। এতদুদ্দেশ্যে আমার সোদরপ্রতিম মতিলাল ভৌমিক, বি.এ. মহাশয়কে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইনি একাধারে বিদ্বান্, ব্রহ্মচারী ও ধার্মিক ছিলেন।

আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, তাঁত ও বেতশিল্প

যে শিক্ষার সহিত ব্যবহারিক জীবনের যোগাযোগ নাই সে-শিক্ষা কার্যকরী হইতে পারে না। এই জন্য গোপালবাড়ীতে পূর্বেই তাঁত ও বেতশিল্পের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। পরে টোলের সহিত আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় খুলিবার সঙ্কল্প করিলাম। সংস্কৃত শিক্ষার সহিত আয়ুর্বেদ শিখিবারও সুবিধা হইবে। উপযুক্ত

শিক্ষকও পাওয়া গিয়াছে। বরিশাল জিলার ন্যায় ও দর্শনের পণ্ডিত কবিরাজ জানকীনাথ দাসগুপ্ত ছিলেন কলিকাতার স্বনামধন্য দ্বারিক কবিরাজ মহাশয়ের শিষ্য ও খ্যাতনামা কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের সহাধ্যায়ী। বিশেষ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও কবিরাজ মহাশয় অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তিনি স্বেচ্ছায় আমাদের আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরামর্শে ভেষজোদ্যান করিবার জন্য ৫/০ বিঘা জমি খরিদ করিলাম। ঐ জমি ছিল ভূতপূর্ব পূজারী বিহারীদাস ব্রজবাসীর। কমিটীর সহিত বিরোধ করিয়া তিনি ঐ জমি বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক বেশী মুল্যে সেই জমিটা আবার আমরা খরিদ করিলাম। ঐ জমির মালেক ঐ জমির জন্য খাসদখলের মোকদ্দমা করিতেছিলেন, তাঁহাকেও মোটা টাকা দিয়া মোকদ্দমা সোলেসূত্রে মিটমাট করিয়া লইলাম এবং তারকাটার দ্বারা জমি ঘিরিয়া ফেলিলাম। উদ্যানে জলসেচনের জন্য বাগেরহাটের এস-ডি-ওকে ধরিয়া ১২০০৲ টাকা ব্যয়ে একটা বড় পাকা ইঁদারা খনন করা হইল। ঐ ব্যয়ের ½ অংশ আমাদিগকে বহন করিতে হইল। ইঁদারা হইতে জল তুলিবার জন্য ২০০৲ টাকা ব্যয়ে একটি ফোর্চ পাম্পও (Forch pump) খরিদ করা হইল। শ্রীশ্রীগোপালের সকল কাজই বরাবরই আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেই করিতে হইত। এত সব ব্যয়সাধ্য কাজ যে কিরূপে হইয়া যাইত তাহা ভাবিলে এখন স্বপ্নবৎ মনে হয়। তখন শ্রীশ্রীগোপাল কৃপা করিয়া একটা অদ্ভুত মনোবল দিয়াছিলেন, তাই ঐ সব কাজ শত অভাবের মধ্যেও সম্পন্ন হইয়া যাইত।

মূলঘরের নেপালচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথের বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি তাঁহার কয়েকজন বন্ধুসহ একদিন গোপালবাড়ীতে আসেন। সমস্তদিন থাকিয়া সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া ও প্রসাদাদি পাইয়া

তিনি পরিদর্শন বহিতে লিখিয়া গেলেন—"এ রকম একটা অজ-পল্লীগ্রামে কি প্রকারে উপেন ভায়া এত টাকা তুলিয়া এরূপ একটা কাজ করিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।"

বৃহৎ সাহায্যের বৃথা আশা

(ক) খুলনার প্রসিদ্ধ উকীল ও জেলাকংগ্রেসের সভাপতি নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীগোপালবাড়ীতে আসিতেন। গোপালবাড়ীর বহু মালিমোকদ্দমায় তাঁহার নিঃস্বার্থ ও অকুণ্ঠ সাহায্য পাইয়াছি। ধার্মিক ও সজ্জন বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। আমার প্রতি তাঁহার অকপট স্নেহও ছিল। এক-সময়ে নগেনবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লটারীতে বহু টাকা পাইয়াছিলেন। নগেনবাবু সেই টাকা কোন জনহিতকর কার্যে ব্যয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোপালবাড়ীর প্রতি তাঁহার খুবই সহানুভূতি ছিল। একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি তোমার আশ্রমে কি কি করিতে চাও এবং মোট কত টাকা প্রয়োজন তাহার একটা স্কীম তৈয়ার কর।" উঁহার কথায় "শ্রীশ্রীগোপাল আশ্রমের উদ্দেশ্য" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাপাইয়া তাঁহাকে দিয়াছিলাম। কয়েকবার তিনি গোপালবাড়ী দর্শন করিতেও আসিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্রমের জন্য কিছুই পাওয়া যায় না।

(খ) একবার আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতির উদ্দেশ্যে কলিকাতা শ্যামাদাস বৈদ্য-শাস্ত্রপীঠের প্রাণস্বরূপ স্বনামধন্য শ্যামা-দাস বাচস্পতি মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র বিমলাপ্রসন্ন তর্কতীর্থ এম্. এল. এ. মহাশয়কে চেষ্টা করিয়া গোপালবাড়ীতে আনাইয়া-ছিলাম এবং যাহা কিছু করা হইয়াছে ও যাহা ভবিষ্যতে করিবার আশা করি—তাহার সবই তাঁহাকে জানাইলাম ও দেখাইলাম। তাঁহার সহিত কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিও আসিয়াছিলেন। তিনি

অনেক রকম আশাও দিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই।

(গ) অতঃপর আমি বাংলাদেশের দাতাশিরোমণি কাশিম-বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সহিত দেখা করি। আমার সঙ্গী ছিলেন বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম্. এ., বি. এল. এবং রাঁচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক আমার স্বগ্রামবাসী চিরকুমার ক্ষিতীশচন্দ্র বসু, বি. এ.। ক্ষিতীশচন্দ্র নিষ্কিঞ্চন বাবাজীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। শীতকাল। ক্ষিতীশ মাত্র কৌপীন আচ্ছাদন বহির্বাস ও ছিন্নকন্থা গায়ে মহারাজ সমীপে উপস্থিত হইতে কুণ্ঠিত হন নাই। মহারাজা তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিলেন। মহারাজা আমাদের সঙ্গে প্রায় চারি ঘণ্টা গোপাল-বাড়ীর নানা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন এবং গোপাল-বাড়ীতে আসিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছুদিন পরে মহারাজা ইহধাম ত্যাগ করেন। মহারাজার পুত্র শ্রীশচন্দ্র নন্দী,—আইন সভার সভ্য ও মন্ত্রী। তাঁহার সহিতও দেখা করিয়া আশ্রমের বিষয় সব জানাইয়াছিলাম। তিনি গোপালবাড়ীতে আসিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু আসেন নাই।

ক্ষিতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কমিটীতে যোগদান

রাংদিয়া পরগণার জমিদারদের নায়েব বসন্তকুমার বল আমাকে প্রহার করিলে যে ফৌজদারী মোকদ্দমা হয় তাহা আপোষ নিষ্পত্তি হওয়ার পর জমিদার ক্ষিতিপ্রসন্নবাবু কাছারীতে আসিয়া আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহার কাছারীতে গিয়া দেখা করিলাম।

কিছুদিন পূর্বেও অধ্যক্ষ কামাখ্যাবাবু, উকীল গিরিশবাবু আশুবাবু ক্ষিতীশবাবু ও আমি উঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। তখন গোপালবাড়ী সম্বন্ধে উঁহার সহিত বহু আলোচনা হইয়াছিল এবং তখন কিছু অপ্রিয় কথাও হইয়াছিল। ক্ষিতিবাবুকে তখন আমি বলিয়াছিলাম যে, ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ অত্যন্ত হতভাগ্য, কারণ তাঁহাদের নিকট যাঁহারা যান তাঁহাদের অনেকেই স্ব স্ব স্বার্থে তাঁহাদের স্তাবকতা করিয়া থাকেন। তাঁহারা অপ্রিয় সত্য ও হিতকর বাক্য শুনিতে অভ্যস্ত নহেন তজ্জন্য তাঁহাদের ভুলত্রুটী সংশোধনের সুযোগ তাঁহাদের হয় না। সেবারের আলোচনা নিষ্ফলই হইয়াছিল। সেদিন গিরিশবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার সঙ্গে গিয়া কোনদিন হয়ত অপমানিত হইতে হইবে। যাহা হউক, এবারে তাঁহার মনোভাবের পরিবর্তন দেখিলাম। তিনি বলিলেন, "উপেনবাবু, নানাকারণে আপনাকে কিছুটা ভুল বুঝা হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, আপনার ন্যায় নিঃস্বার্থ নিরলস কর্মী বিরল। গোপালসেবা ও মন্দিরাদির সংস্কার জন্য আপনি যে কাজ এতদিন করিয়াছেন, সেগুলি কর্তব্য ছিল আমাদেরই। এক্ষণে আপনার সঙ্গে যোগ দিয়া আপনার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কিছু গোপাল-সেবার কাজ করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। যদি আমাকে একজন দীন সেবক হিসাবে কমিটীর সাধারণ সভ্য করিয়া লয়েন তবে যেটুকু সাধ্য আপনার সঙ্গে কাজ করিয়া যাইব।"

আমি বরাবরই আশাবাদী। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "শ্রীশ্রীগোপালের সেবার মাধ্যমে আমার বা আমাদের কাহারো কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নাই। আপনি যদি আন্তরিকতার সহিত গোপালমন্দির-কমিটীতে যোগদান করিতে চাহেন তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না।"

ক্ষিতিবাবুর প্রস্তাবে আমি কোন দুরভিসন্ধির সন্দেহ করি নাই। পরে কমিটীর সভা আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব উত্থাপন

করিলে কোন কোন সভ্যের মনে দ্বিধা ও সন্দেহ জাগিলেও আমার ঐকান্তিক ইচ্ছায় তাঁহাকে কমিটীর সভ্য করিয়া লওয়া হইল। কমিটীর সদস্য করিয়া লইবার পর ক্ষিতিবাবুকে প্রসাদ পাইবার জন্য একদিন গোপালবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলাম। এক রবিবারে দিন ধার্য হইল। কমিটীর কয়েকজন সভ্য ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও ঐদিন উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে মন্দির সংস্কারের কার্য, স্কুল, টোল, আয়ুর্বেদ-উদ্যান প্রভৃতি সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়া ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি এইসব দেখিয়া শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও প্রসাদ পাইলেন।

যেমন শ্রীভগবৎ পূজান্তে দক্ষিণা না দেওয়া পর্যন্ত পূজা সমাপ্ত হয় না, তেমনি আমার উপর প্রহারের দক্ষিণা লওয়ার পর শ্রীশ্রীগোপালের পূজা সম্পন্ন হয়। এইবারে দীর্ঘ ২০।২২ বৎসর বিবাদ একপ্রকার নির্বাপিত হইল।

ভগবৎ সেবাকার্যে বিপদাপদ অনিবার্য। বিপদ তিনিই দেন, আবার রক্ষা করেনও তিনি। ইহা তাঁহার পরীক্ষাও হইতে পারে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

যে করে আমার আশ, করি তার সর্বনাশ।
তবু নাহি ছাড়ে আশা, আমি হই তার দাসের দাস ॥

অন্যের কি কথা—আদি ভক্তিরসের মূল তরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীকেও শ্রীশ্রীগোপাল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অতিবৃদ্ধ আযাচকবৃত্তিপরায়ণ শ্রীপাদকে তিনি বৃন্দাবনে আদেশ দিলেন—অতি দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল ১৫০০ শত মাইল দূরস্থিত শ্রীপুরীধাম হইতে মলয় চন্দন ও কর্পূর আনয়ন কর, অন্যের দ্বারা আনাইলে হইবে না, নিজেই গিয়া আনিবে। পুরীপাদ কষ্ট ও বিপদ চিন্তা না করিয়া 'শ্রীগোপাল পরিয়া আনন্দ পাইবেন'—এই সেবানন্দে বিভোর হইয়া সেই সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া পুরীধামে উপনীত

হইলেন এবং একমণ চন্দন ও ৬০ তোলা কর্পূর সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে রওনা দিলেন। অতিবৃদ্ধ কি করিয়া এত পথ এই ভার বহন করিবেন, সে চিন্তা নাই। কোন প্রকারে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রেমুণা পর্যন্ত আসিলে শ্রীগোপাল কৃপা করিয়া কহিলেন "শ্রীগোপীনাথ ও আমি অভিন্ন তনু, গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন দিলে আমার তাপ যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীগোপীনাথ চরিত্র বলিতে বলিলেন, "পরীক্ষা করিয়া গোপাল হৈল দয়াবান।" কাজেই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রকেও যখন পরীক্ষা দিতে হয়, তখন যে কোন সেবককে পরীক্ষা দিতে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি! এই পরীক্ষাই ভগবৎ করুণা।

জমিদার দেবীপ্রসন্নবাবুর কমিটীতে যোগদান

রাংদিয়ার জমিদার ক্ষিতিপ্রসন্নবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র দেবীপ্রসন্নবাবু রাংদিয়া পরগণার জমিদারির চারি আনার অংশ বাটোয়ারা মোকদ্দমা দায়ের করিয়া ভাগ করিয়া লয়েন, ফলে লাউপালার গোপালবাড়ী তাঁহার অংশভুক্ত হয়। পূর্বে রাংদিয়া পরগণার ষোল আনার কাজকর্ম সতীপ্রসন্নবাবু পরিচালনা করিতেন।

সতীপ্রসন্ন বাবুর সহিত শ্রীশ্রীগোপালের মোকদ্দমা চলা-কালে দেবীপ্রসন্ন বাবু কয়েকবার বাগেরহাট আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত গোপালবাড়ী সম্বন্ধে আলোচনা করিলে তিনি ক্ষিতিবাবুর কার্যের নিন্দা করিয়া আমাদের অনুকূলে সহানুভূতি-সূচক কথা বলেন। এখন তাঁহার নিজের চারি আনা অংশে শ্রীগোপালবাড়ী পড়িলে তিনি যখন রাংদিয়া কাছারী দখল লইয়া ওখানে আসিলেন তখন আমরা তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। অনেক আলোচনা হইল। গোপালের সেবা ও আশ্রমাদি সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিসূচক কথা বলিলেন, এবং তাঁহাকে

কমিটিতে লইলে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। এই সময় আমাদের কমিটীর সভাপতি ত্রৈলোক্যবাবু অপ্রকট হইয়াছেন। তাঁহার স্থলে দেবীপ্রসন্নবাবুকেই সভাপতি করিয়া লওয়া হইল। ত্রৈলোক্যবাবু জীবিত থাকাকালে তাঁহার পুত্র জ্যোতিষবাবুকে কমিটীর সভ্য করিয়া লওয়া হয় এবং দশানির জমিদার বন্ধুপ্রবর রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়কে সহকারী সভাপতি করিয়া লওয়া হয়। জ্যোতিষবাবু তাঁহার পিতার সহকারীরূপে রথের মেলার সময় বর্ষা ও কাদাকে উপেক্ষা করিয়া ২০৷২২ দিন রথের কার্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার পিতার অপ্রকটের পর ঐ কার্যের সম্পূর্ণ ভার তিনিই গ্রহণ করেন।

ক্ষিতিবাবুর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

দেবীপ্রসন্নবাবু যাত্রাপুর কাছারীর দখল লওয়ার পর, যাত্রাপুর নদীর চর ও যাত্রাপুর বাজার-সংলগ্ন জমি লইয়া বারো আনার অংশীদার ক্ষিতিপ্রসন্নবাবুর সহিত তাঁহার মামলা হয়। ঐ মামলায় দেবীপ্রসন্নবাবু আমাকে সাক্ষী মানেন। তিনি আমাকে বলেন, আমার সাক্ষ্যে তাঁহার বিশেষ উপকার হইবে। আমি দেখিলাম, দেবীপ্রসন্নবাবুর স্বার্থের অনুকূলে সাক্ষ্য দিতে হইলে কিছু কিছু সত্যের অপলাপ করিতে হয়। তজ্জন্য আমি তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম। আমাকে দেবীপ্রসন্ন বাবুর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অসম্মত জানিয়া ক্ষিতিপ্রসন্নবাবু আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধে আমি তাঁহার নূতন কাছারীবাড়ীতে দেখা করিতে গেলাম। আমাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন এবং ঠাকুরকে নিবেদনের যোগ্য জলখাবারাদির ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ক্ষিতিবাবু বলিলেন, "আপনি আমাদের লোকজন কর্তৃক দীর্ঘদিন যাবৎ যে ভাবে বিপন্ন ও নির্যাতিত হইয়াছেন,

তাহাতে আমার আশঙ্কা ছিল আপনি সম্ভবত আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার চরিত্রের মহত্ত্ব দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইয়াছি। আপনাদের সহিত গোপালের মন্দির বা জমিজমা দেবীর অংশে পড়িলেও আপনি যখনই প্রয়োজন মনে করিবেন, অকুণ্ঠভাবে আমার কর্মচারিগণকে বলিবেন, তাঁহারা আপনার সাহায্য করিবে। সর্ববিষয়ে আপনার সহযোগিতা ও সাহায্য করিবার জন্য আমি তাঁহাদের নির্দেশ দিয়া যাইব।"

পূর্বে শ্রীশ্রীগোপালের পূজারী বিহারী ব্রজবাসীর কথা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি জমিদার কর্মচারিদের প্রলোভনে পড়িয়া গোপালের রথের মেলার ও অন্যান্য আয় ভোগ করিবার ইচ্ছায় বিপক্ষের সহিত মিলিত হইয়া আমার নামে এক ফৌজদারী মামলা করেন, (Case No. 12M 156 of 1925) কিন্তু বিফল মনোরথ হন। এইজন্য তাঁহাকে আর গোপালের সেবা করিতে দেওয়া হয় না। ইহার বিশেষ বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

বিহারী চলিয়া যাইবার পর আমরা পরবর্তী পূজারী নিয়োগের বিষয় ভাবিতেছিলাম। আমি বাগেরহাট গোবিন্দমন্দিরের সহিত ও লাউপালা গোপালবাড়ীর সহিত বহুদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট থাকার অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বাঙ্গালী পূজারীর দ্বারা এই সব সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে চলে না, কারণ মধ্যে মধ্যে উৎসবাদি উপলক্ষে যে অতিরিক্ত চাপ পড়ে, সেই পরিশ্রম সহ্য করা বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ গোপালবাড়ীতে বহু দূরবর্তী স্থান হইতে ভোগ দেওয়ার জন্য এবং গোপালের প্রসাদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অনেক ভক্তের সমাগম প্রায়ই হইয়া থাকে। তজ্জন্য উপযুক্ত পূজারী নিয়োগের কথা চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় বিহারী পূজারীর সময়ের পরিচিত এক উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বেচ্ছায় পূজারীর কার্য করিতে সম্মত হইলে তাঁহাকেই গোপালের সেবার কার্যে

নিযুক্ত করা হইল। বুঝিলাম, গোপাল তাঁহার নিজ সেবার ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইলেন। নূতন সেবাইতের নাম অনিরুদ্ধ দাস বাবাজী।

বাবাজী সেবার কার্য আন্তরিকতার সহিত করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে ভোগ পাক করিয়া, ভোগ দিয়া, নিজেই ভক্তগণকে পরিবেশন করিতেন। একদিনের কথা মনে আছে। আমাদের সভাপতি ত্রৈলোক্যবাবু প্রসাদ পাইতে বসিয়া বলিয়াছিলেন, "এতদিন পরে গোপাল খাইয়া সুখী হইয়াছেন।" বাবাজীর মেজাজটা একটু রুক্ষ বলিয়া গোপালবাড়ীর সেবকগণ প্রায়ই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেন। আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইতাম যে, গোপালসেবা সুষ্ঠুভাবে হইতেছে কিনা তাহাই দেখিতে হইবে। তাহা যদি হয়, তবে একটু ব্যবহারবৈগুণ্য সহ্য করিয়া চল। এইভাবে তিনি কয়েকবৎসর সেবার কার্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি আবশ্যকমত তাঁহার কিছু কিছু খরচের টাকা আমার নিকট হইতে লইতেন। কিন্তু বেতন সবসময় হিসাব করিয়া লইতেন না। তিনি ছিলেন উদাসীন বাবাজী, তাঁহার সংসারাসক্তি বলিতে বিশেষ কিছু ছিল না। এইভাবে তাঁহার বেতন কিছু বাকী পড়িয়া গেল। আমাদের গোপালসেবার কার্যের উৎকর্ষ দেখিয়া কিছু সংখ্যক লোক মাৎসর্যপরায়ণ হইয়া পড়িল। তাহারা বাবাজীর মনে একটা ধারণা জন্মাইয়া দিল যে, তিনি বাকী বেতনের টাকা আর পাইবেন না। ইহা ভিন্ন আরও কিছু অবান্তর কারণে তিনি গোপালসেবা ছাড়িয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়া একদিন তাঁহার সমস্ত প্রাপ্য বেতনাদি শোধ করিয়া দিতে বলিলেন।

কমিটীকে গোপাল কোনদিনই সচ্ছলতার মধ্যে রাখেন নাই। শত অভাব অনটনের মধ্যে রাখিয়াই তাঁহার কিছু সেবার কার্য করাইয়া লইতেন। সমস্ত প্রাপ্য টাকা একসময়ে চাওয়ায় আমি

বলিলাম, "সব টাকা এখনই দেওয়া সম্ভব নহে। কিছু টাকা নগদ দিতেছি, এবং বাকী টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিব। সেই টাকা রথের সময় পরিশোধ করিব।"

ইহার পর তিনি চলিয়া গেলেন এবং কিছুদিন আর দেখা-সাক্ষাৎ করেন নাই। হঠাৎ একদিন আমার নামে হ্যাণ্ডনোটের নালিশের সমন আসিল। আমার উকীলবাবুরা বলিলেন— "এ মোকদ্দমার জবাব দিলে বাদী কিছুতেই ডিগ্রী পাইতে পারেন না।" তাঁহাদিগকে আমি বলিলাম, "টাকাটা তাঁহার ন্যায্য পাওনা, আইনের ফাঁকে তাঁহাকে বঞ্চনা করিব না।" তারপর কর্জ করিয়া তাঁহার পাওনা শোধ করিয়া দিলাম।

আর একবার একটা তামাদি টাকাও আমি পরিশোধ করি। একবার গোপালের জন্য বাগেরহাট ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক হইতে কিছু টাকা কর্জ লওয়া হয়। ব্যাঙ্ক ফেল হইলে ঐ খত-খানা বনগাঁয়ের এক ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন। তিনি আমার নিকট আসিলে আমি বলিলাম, "মোকদ্দমার দ্বারা আমার নিকট হইতে এই টাকা আদায় করা অসম্ভব। কিন্তু টাকা আমি আপনাকে দিব। সমস্ত টাকা এককালীন দেওয়া সম্ভব নহে, আমি একখানা কিস্তিবন্দী রেজেষ্ট্রী করিয়া দিতেছি।" তাহাই করা হইল। এক কিস্তির টাকা লইবার পর উক্ত ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তাহার পর বহুদিন আর কেহ টাকা লইতে আসে নাই এবং কিস্তিবন্দীর দলিলও তামাদি হইয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে একবার রথের সময় ঐ ব্রাহ্মণের পুত্র ম্লানমুখে দলিলখানা লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলেন, "আমাদের কিস্তিবন্দী তামাদি হইয়া গিয়াছে, বাবা মারা যাওয়ার পর আমরা আর আসিতে পারি নাই। এখন উপায় কি?"

আমি বলিলাম—"আইনে তামাদি হইলেও প্রাপ্য টাকা তামাদি হয় নাই।" আমি তখনই কিছুটা টাকা উসুল দিয়া

দিলাম, এবং বাকী টাকাটা আগামী তুই বৎসরে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিলাম। শ্রীশ্রীগোপালের কৃপায় প্রতিশ্রুতিমত টাকা পরিশোধ করা হইয়াছিল। খুব সম্ভব টাকার পরিমাণ ছিল তিন শত।

টাকা পরিশোধের পর সরকারী কার্যব্যপদেশে একদিন আমি বনগ্রাম গেলে উক্ত ব্রাহ্মণের স্ত্রী আমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা! তামাদি টাকা এ-যুগে কেহ পরিশোধ করে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই।"

অনিরুদ্ধদাস বাবাজী চলিয়া যাওয়ার পর ক্রমান্বয়ে তুইজন বাঙ্গালী পূজারী নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা কাজ ভালভাবে চলিত না। এজন্য চিতলমারীর নৃসিংহ গোপাল-জীউর আখড়ার মোহান্ত বাসুদেব বাবাজীকে তাঁহার গোপালসহ লাউপালার গোপালবাড়ীতে আনিলাম। বাসুদেব বাবাজী আমাকে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তাঁহার নিজের আখড়া ও বিগ্রহ সেবার জন্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি থাকায় ও চিতলমারী হাটে একটা তোলা পাওয়ার নিমিত্ত তিনি এখানে স্থায়ীভাবে থাকিতে পারিতেন না। পূজারীর জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম ও কোন উপায় নিরূপণ করিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীগোপালের শরণাগত হইলাম।

সেই পূর্বের বিহারী ব্রজবাসী পূজারী এতদিন পর্যন্ত নানারূপ অসুবিধার মধ্যে নানাস্থানে থাকিয়া একদিন একজন লোকদ্বারা এই সংবাদ দিলেন যে, আমরা যদি তাঁহাকে পুনরায় বিশ্বাস ক'রে রাখি তবে তিনি শেষজীবন পর্যন্ত শ্রীশ্রীগোপালের ওখানে থাকিয়া সেবার কাজ করিতে পারেন। পূর্বে বহুদিন যাবৎ গোপাল-সেবা করাতে গোপালের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক টান ছিল। ব্রজবাসীর আসিবার ইচ্ছা জানিয়া আমরা একটু আশ্বস্ত হইলাম। একে তিনি ব্রজবাসী তদুপরি বহুদিন গোপালের

সেবা করায় তৎপ্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতি আছে। গোপালের সেবার দিকে চাহিয়া আমার বিরুদ্ধে তিনি যে মোকদ্দমা ও অন্যান্য দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গেলাম। বলিলাম,—"হ্যাঁ, তিনি আসিলে রাখিতে পারি।" আমার আশ্বাস পাইয়া বিহারী ব্রজবাসী পরদিনই আসিলেন, কিন্তু যেন একটু লজ্জিত-ভাবে। তাঁহাকে আমি বলিলাম যে, সঙ্কোচের কোন কারণ নাই—ভাইয়ে ভাইয়ে ও পিতাপুত্রেও কত অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়া থাকে। আপনি মনপ্রাণ দিয়া সেবার কাজ করিতে থাকুন। উঁহাকে পুনর্নিয়োগে গোপালবাড়ীর কর্মীদের ও কমিটীর সভ্যদের মধ্যে কাহারও কাহারও আপত্তি ছিল; কিন্তু সকলেই আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন বলিয়া আমি যাহাই করিতাম তাহাই তাঁহারা অনুমোদন করিতেন। একদিন গোপালমন্দির কমিটীর সভায় বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ কামাখ্যাবাবু ও কমিটীর সভাপতি ত্রৈলোক্যবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, "গোপালের কাজ সম্বন্ধে আপনাকে আমরা blank cheque-এ সই করিয়া দিতেছি, আপনার বুদ্ধিমত যাহা ভাল মনে করিবেন আমরা তাহা অনুমোদন করিব।"

বিহারী বাবাজী শ্রীশ্রীগোপালের সেবা আন্তরিকতার সহিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু পূর্বোক্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার সময় তাঁহাকে জোরপূর্বক বাহির করিয়া দেওয়া ও মোকদ্দমায় তাঁহার অসাফল্যে তাঁহার মনে যে ক্ষোভ জন্মিয়াছিল তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই বলিয়া কাহারও কাহারও কাছে আমার নিন্দা করিতেন। ইহাতে আমার সহকর্মিগণ অত্যন্ত দুঃখবোধ করিয়া বিহারী পূজারীকে অপসারণ করিবার জন্য আমাকে বলিতেন। তাঁহাদিগকে আমি বুঝাইতাম,—"পূজারী গোপালসেবা করিতে-ছেন কিনা তোমরা তাহাই দেখিও, আমাকে নিন্দা করিলেন কিনা তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীগোপালের সেবা, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই লোককে শ্রদ্ধা ও প্রীতি দেখাইবে।" যাহা হউক, সম্ভবতঃ আমার আচরণে বিহারী পূজারী ক্রমে তাঁহার মনোভাব পরিবর্তন করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে অত্যন্ত প্রীতি ও বিশ্বাস করিতেন। পূজারীর কিছু টাকা ছিল, তাহা দ্বারা তিনি চাউল ও সুপারী খরিদ-বিক্রয় ও লগ্নী করিয়া কিছু আয়ের চেষ্টা করিতেন।

আমার অনুপস্থিতিতে বিহারীর অপ্রকট

খুলনা জিলাবোর্ডের কর্ণধারগণের মধ্যে একজন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচনপ্রার্থী হইয়া তাঁহার লোক দ্বারা আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে নির্বাচনে প্রচারোদ্দেশ্যে আমি আমার সহসেবক মহেন্দ্রনাথ গুহকে তিন সপ্তাহের জন্য ছুটী দিই এবং তন্নিমিত্ত তাঁহাকে মোটা টাকাও দেওয়া হইবে। গোপাল বাড়ীর কোন সেবকের পক্ষে কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হইয়া ভোট প্রার্থনার কাজ অত্যন্ত অসমীচীন বলিয়া মহেন্দ্রনাথকে ছুটী দিতে আমি অস্বীকার করি। আমাকেও বলা হইয়াছিল, "আপনাকে যথেষ্ট লোকে শ্রদ্ধা করে; আপনার সুযোগ-সুবিধা মত যদি কিছু চেষ্টা করেন তবে বিশেষ কাজ হইতে পারে।" উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, "নগেন্দ্রনাথ সেন দেশের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার ও কারাবরণ করিয়াছেন এবং তিনি জেলার সর্বত্র সুপরিচিত। এমন লোকের বিপক্ষে কি বলিয়া প্রচার করিব? যদি তাঁহার বিরুদ্ধে কথা বলি তবে লোকের শ্রদ্ধা হারাইব।" ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হইয়া গেলে একদিন জানিতে পারিলাম যে, রাংদিয়া হাইস্কুল কেন্দ্রে তিনি অতি সামান্যই ভোট পাইয়াছেন এবং ঐ অঞ্চলের তাঁহার অর্থপুষ্ট এজেন্টবৃন্দ এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে, আমার প্রভাবে তাহারা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এজেন্টগণের কৈফিয়ৎ সর্বৈব মিথ্যা ছিল। চাকুরীয়ার পক্ষে

নির্বাচনে কোন পক্ষে প্রচার করা আমি অসঙ্গত মনে করি বলিয়াই আমি কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে বিরত থাকি। তাহা কে শুনে? চাকরী যে করে সে কি আর মানুষ! সেত গোলাম। মনিবের আদেশ পালন করি নাই, অতএব আমাকে জাহান্নামে যাইতেই হইবে। তাহাই হইল। আমাকে পাইকগাছায় বদলীর আদেশ হইল। ইহা বনবাসের আদেশই; তবু ভগবদভিপ্রায় মনে করিয়া পাইকগাছায় গেলাম। গিয়া দেখি, সেখানে কাজ অতি অল্পই। সদরে আমার উপর দুই সার্কেলের গুরুতর কাজের চাপ ছিল। বড় নদীতীরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের এক পার্শ্বে আমার কর্মস্থান। মাঝে মাঝে কার্যব্যপদেশে দাকুপ যাইতাম। স্থানটী অতি সুন্দর, অদূরে নিবিড় সুন্দরবন। অপূর্ব দৃশ্য। দোতালায় ডাক-বাংলা, নীচতলায় ডাক্তারখানা। সরকারী কাজে আমার বেশীক্ষণ অতিবাহিত হইত না; কাজেকাজেই নিরালায় সময়েব সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম। দশ বৎসরে যাহা না পারিয়াছি—এক বৎসরের বনবাসে তাহা পারিলাম—প্রচুর গোস্বামীগ্রন্থ পাঠ করিতে পারিলাম। শাপে আমার বর হইল। নদীর ত্রিমোহনায় অবস্থিত দোতালাবাংলোতে জ্যোৎস্নালোকিতরাত্রিতে ভগবচ্চিন্তার সঙ্গে মনে হইত,—ডিঃ বোর্ডের কর্ণধার আমার একান্ত সুহৃদ, নতুবা আমাকে এরূপ ধর্মানুশীলনের সুযোগ দিবেন কেন।

আমি পাইকগাছায়। ওদিকে গোপালবাড়ীতে বিহারী পূজারী অসুস্থ। অসুখের মধ্যে বার বার আমার কথা বলেন। আমাকে লাউপালায় যাওয়ার জন্য টেলিগ্রাফ আসিল। টেলি-গ্রাফটী তারযোগে যাত্রাপুর হইতে খুলনায় যাইবার পর চিঠিরূপে ষ্টীমারযোগে আমার হাতে পৌছিতে অত্যন্ত দেরী হইল। আমি লাউপালায় পৌঁছিয়া দেখি বাবাজী অপ্রকট হইয়াছেন। উঁহার সঞ্চিত কিছু টাকা ও বন্ধকী গহনা ছিল। গোপালবাড়ীর পূজারী ও চাকর ঐ টাকা ও গহনার কিছু আত্মসাৎ করিয়াছে সন্দেহ করিয়া

যাত্রাপুর কাছারীর লোকেরা ও স্থানীয় পুলিশ-ফাঁড়ির পুলিশ আসিয়া বাবাজীর শয়নঘর তালাবদ্ধ করিলেন এবং উহাদিগকে গ্রেফতার করিবার সঙ্কল্প করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি ওখানে পৌঁছিয়া ঐ সব দেখিয়া ও শুনিয়া বুঝিলাম যে, বিহারী বাবাজীর টাকা গোপালসেবায় লাগার ইচ্ছা যদি গোপালের থাকিত তবে আমাকে তিনি আরো পূর্বে এখানে পৌঁছাইতেন। তাহা যখন হয় নাই, তখন তাঁহার টাকাপয়সা থাকুক আর না থাকুক এবং কাহাকেও যখন উহা আত্মসাৎ করিতে দেখা যায় নাই, তখন শুধু সন্দেহের উপর কাহাকেও পীড়ন করা সঙ্গত হইবে না।

বাবাজীর ব্যবসায়ে যে চাউল ও সুপারী মজুত ছিল তাহা বিক্রয়ে প্রায় এক হাজার টাকা হইল। সেবকবৃন্দের কেহ কেহ ঐ টাকার অর্ধেক তাঁহার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্যে অপর অর্ধেক গোপাল-সেবার জন্য রাখিবার প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু তাহা নীতিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া ঐ সমস্ত টাকা তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ ও মহোৎসব দিয়া ব্যয় করিলাম।

বিহারী বাবাজীর অন্তর্ধানের পর মতিলাল চক্রবর্তী মহাশয়কে অস্থায়ীভাবে পূজারী নিযুক্ত করিয়া স্থায়ী সেবাইত নিয়োগের বিষয় চিন্তা করিতেছি—কয়েকদিন পরে দেখি, পূর্ব-সেবাইত অনিরুদ্ধ দাস বাবাজী আসিয়া উপস্থিত। ওখানে আসিয়া, অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া তিনি স্বেচ্ছায় সেবাপূজার ভার নিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে আমার সহকর্মিগণ আমার নামে তাঁহার হ্যাণ্ডনোটের নালিশাদির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নিয়োগ করিতে আপত্তি জানাইলেন, কিন্তু আমি উঁহার সেবাপূজা ভোগরন্ধন প্রভৃতি কার্যের বিশেষ যোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করিয়া উহাদের আপত্তি খণ্ডন করিলাম। অবশেষে তাঁহাকেই শ্রীশ্রীগোপালসেবার ভার দেওয়া হইল। সেই সময়

হইতে ১৩৬৯ সালের কার্তিক মাস পর্যন্ত সেবাদির কার্য চালাইয়া তিনি অপ্রকট হইয়াছেন।

শরৎচন্দ্র নাথ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদকের ভার গ্রহণ

১৯৪৮ সালে আমি চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তীর্থবাসের অভিপ্রায়ে ভুবনেশ্বর ও পুরীতে বাস করিতেছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে শ্রীশ্রীগোপালের সেবা ও অন্যান্য কার্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বাগেরহাটের উকীল শরৎচন্দ্র নাথ মহাশয় সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। আমার সময়ের মত তাঁহার কয়েক বৎসরের তত্ত্বাবধানকালেও তাঁহাকেও কাছারীর কর্মচারীর প্রতিকূলতা, কখনো বা কিছু আনুকূল্য ও অন্যান্য নানাপ্রকার বিরোধিতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শরৎবাবুর সময়ে পূর্বপাক সরকারের কর্মচারিগণ হাট-বাজার-মেলা প্রভৃতি সরকারের খাস হইয়াছে বলিয়া রথের মেলা স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকের সহিত ডাক বন্দোবস্ত দেওয়ায় খুলনা ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টে মামলা উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ মামলায় আমাদিগকে খুব হয়রান হইতে হয়। কিন্তু অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমে উক্ত ডাক বন্দোবস্ত নাকচ হইয়া যায়। ঐ মামলায় খুলনার জনপ্রিয় সুবিখ্যাত সমাজসেবী প্রমথনাথ ভৌমিক এম.এ., বি.এল মহাশয় নিঃস্বার্থে গোপাল-কমিটীকে যে সহায়তা করিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়।

শরৎবাবু কয়েক বৎসরে ক্রমে ক্রমে গোপালজীউ-মন্দির, বৈষ্ণবখণ্ড, অতিথিশালা ও সমাধি-মন্দির প্রভৃতির মেরামত করাইয়াছেন। পূর্বপাকিস্তানে কংগ্রেসের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী হিন্দুদের প্রাচীন মঠমন্দির প্রভৃতির সংস্কারসাধন জন্য সাহায্য দান করিয়াছিলেন। ঐ সময় গোপাল-কমিটী

৫০০৲ টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সরকারের উক্ত দান ও মেলায় প্রাপ্ত প্রণামির টাকা দ্বারা উক্ত মেরামত কার্য করান হয়। ঐ মেরামত কার্যে শরৎবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণদাস নাথ মহাশয়ের ভক্তিমতী স্ত্রী প্রমীলাবালা দেবী ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মন্দিরাদি মেরামত ব্যতীত রথ রাখিবার একখানি পাকা দেওয়ালের নূতন উঁচু ঘরও তিনি নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

বালকদাস বাবাজীর সময়ে ও পরে বহুদিন যাবৎ যে রথে রথযাত্রা হইত, তাহা কালক্রমে জীর্ণদশাপ্রাপ্ত হওয়ায় নূতন রথ নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন হয়। বাগেরহাট মহকুমাস্থ ফকিরহাট থানার অন্তর্গত বালীয়াডাঙ্গা গ্রামের অধিবাসী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বি.এ. মহাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য ভট্ট-প্রতাপের কবিরাজ কুলদাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের বাড়ীতে যাইতেন এবং মাঝে মাঝে পথিমধ্যে গোপালবাড়ীতে দর্শন ও বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। দর্শনসময়ে তিনি শ্রীশ্রীগোপালের চরণে রোগমুক্তির প্রার্থনা ও মানৎ করিতেন। ভগবদেচ্ছায় রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সত্যেনবাবু স্বেচ্ছায় একখানি নূতন সুন্দর রথ তৈরী করাইয়া দিয়াছেন। সত্যেনবাবু ধনী নহেন; তৎসত্ত্বেও প্রাণের আবেগে রথনির্মাণে ৪।৫ (চারি পাঁচ) হাজার টাকা সানন্দে ব্যয় করিয়া সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শরৎবাবুর তত্ত্বাবধান-সময়ে পূর্ববঙ্গের কংগ্রেসনেতা পূর্বপাক বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় খুলনার সুবিখ্যাত উকীল ক্ষেত্রনাথ মিত্র ও বাগেরহাটের প্রসিদ্ধ উকীল নারায়ণচন্দ্র দে গোপালবাড়ীর বৈষয়িক ও অন্যান্য ব্যাপারে সর্বদা গোপাল-কমিটীকে উপদেশাদি দ্বারা সহায়তা করিতেন এবং এখনো কমিটী উঁহাদের উপদেশ পাইয়া থাকেন।

কার্তিকদিয়ানিবাসী সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২০।২২ বৎসর যাবৎ

শ্রীশ্রীগোপালের বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ জন্য নায়েবপদে নিযুক্ত থাকিয়া যোগ্যতা ও সততার সহিত কর্তব্য পালন করিয়া আসিতেছেন। আদায়-তহশীল ও সম্পত্তি-রক্ষণাবেক্ষণ, মালি-মোকদ্দমা, রথের মেলা মিলান ও প্রণামী সংগ্রহ প্রভৃতি কার্যে সুরেনবাবুর নিষ্ঠা ও শ্রম বিশেষ প্রশংসনীয়।

প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে দুই সপ্তাহব্যাপী এক বিরাট মেলা বসিয়া থাকে। এই উপলক্ষে সহস্র সহস্র দর্শনার্থী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়া থাকেন। এই মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য গোপাল-কমিটীর উদ্যোগে প্রতি বৎসর একটি মেলা-কমিটী গঠিত হয়। এই কমিটীতে স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়া মেলার ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলারক্ষা ও প্রণামীসংগ্রহে সহায়তা করিয়া থাকেন। মেলা-পরিচালনায় স্থানীয় মুসলমানগণের প্রতিবেশী-সুলভ মনোভাব ও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

নারায়ণচন্দ্র দে মহাশয় কর্তৃক সম্পাদকের ভার গ্রহণ

১৯৫৯ সালে শরৎবাবু সম্পাদকের দায়িত্ববহনে অপারগ হইলে বাগেরহাটের উকীল নারায়ণচন্দ্র দে মহাশয় উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। মালি-মোকদ্দমা প্রভৃতি নানারূপ বাধাবিঘ্নের মধ্যেও অবিচলিতভাবে তিনি সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও পরিচালন করিতেছেন।

১৯৬১ সালের প্রবল ঝড়ে রথের গৃহটী ভূমিসাৎ হইয়া যায়, বকুলগাছ পতিত হইয়া পুকুরের পাকা চত্ত্বর ও সিঁড়ি এবং নাট-

মন্দির ও ভোগ ও ভাণ্ডারঘরেরও বিশেষ ক্ষতি হয়। ঐ বৎসর আমি শ্রীশ্রীগোপালদর্শনে গেলে নূতন রথ প্রতিষ্ঠাতা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে জানাইলেন যে, ঝড়ে রথগৃহ ভূমিসাৎ হওয়ায় রোদবৃষ্টিতে মূল্যবান রথখানার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। অতএব অবিলম্বে উহা সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে অভিভূত হইয়া আমি অবিলম্বে বাগেরহাটে গমন করিলাম।

পাকা রথগৃহ নির্মাণ করিতে এবং অন্যান্য গৃহ ও ঘাট মেরামত করিতে প্রায় ৫০০০৲ হাজার টাকা সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। ইহা ভাবিয়া গোপালমন্দির কমিটীর বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বাগেরহাটের উকীল নারায়ণচন্দ্র দে ও ব্যবসায়ী নারায়ণ চন্দ্র নাথ ও প্রফুল্লকুমার নাথ মহাশয়গণ ও আমি সাহায্যের আবেদনপত্রসহ বাগেরহাটে কতিপয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলাম। বাগেরহাটের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে বসিয়া পরামর্শ করিয়া ভিক্ষার নিমিত্ত বাহির হইবার সময়ে উঁহাদের প্রত্যেকেই ২৫১৲ টাকা করিয়া ভিক্ষা দিবার প্রতিশ্রুতিতে সই করিয়া দিলেন। শ্রীশ্রীগোপালের অপার করুণায় বাগেরহাট ও খুলনা সহরের ধর্মপরায়ণ কয়েক ব্যক্তির নিকট হইতে প্রায় ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। উক্ত টাকা দ্বারা নারায়ণচন্দ্র দে, মহেন্দ্রনাথ গুহ ও নারায়ণচন্দ্র নাথ মহাশয়গণের চেষ্টায় ভোগমন্দির, ভাড়ার ঘর ও পুকুরের ঘাটের মেরামত কার্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং রথগৃহের চারিপার্শ্বের পাকা দেওয়ালে ছাদ-থামাল পর্যন্ত গাথুনির কার্য শেষ হইয়াছে। আশা করিতেছি —অক্লান্তকর্মী নারায়ণচন্দ্র নাথ মহাশয় যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে রথগৃহের ছাদ প্রভৃতি অবশিষ্ট কার্য সত্বর সুসম্পন্ন হইবে।

শ্রীশ্রীগোপালের অলৌকিক কাহিনী

শ্রীগোপালের সেবাকার্যে ব্যাপৃত থাকাকালে তাঁহার সম্বন্ধে যে-সকল অলৌকিক প্রভাবের বিষয় অবগত হইয়াছি তাহার কয়েকটি এ স্থলে প্রদত্ত হইল :

(১) একবার মন্দিরের পশ্চাদ্দিকের জানালা ভাঙ্গিয়া শ্রীগোপাল বিগ্রহ ও তাঁহার গহনা সব চুরি হইয়া যায়। ইহাতে অনেকেই ধারণা করিয়াছিলেন যে, বিগ্রহ অপসারিত করিতে পারিলে কমিটীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে বাধ্য, এই বিশ্বাসে প্ররোচনা দ্বারা বিগ্রহ অপসারিত করানো হইয়াছে। চুরির কয়েক মাস পরেই রথযাত্রা উৎসব। রথযাত্রার দিন শ্রীগোপাল ও শ্রীজগন্নাথের রথে বিজয় করিবার সময় উপস্থিত। রথের ঘর হইতে রথ বাহির করিয়া সাজানো হইতেছে, লোকে লোকারণ্য —এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল—একটি বালক রথের নীচে এক গোপালবিগ্রহ পাইয়াছে। দৌড়িয়া গিয়া দেখি—একটি সুন্দর বালকের হাতে আমাদেরই গোপাল। বালকটীকে পুরস্কৃত করিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

রাত্রে মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আছি, এমন সময় কয়েক-জন লোক নানা ভোগোপচারসহ উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের গ্রামে গোপালের রথযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে, এবার গোপাল তাহাদের কয়েকজনকে স্বপ্নাদেশ করিয়াছেন যে, এবার তিনি লাউপালার রথে যাইতেছেন, তাহারা যেন সেখানে গিয়া তাঁহার ভোগরাগ দেয়। এইজন্যই তাঁহারা ভোগের দ্রব্যাদিসহ ওখানে আসিয়াছিলেন।

(২) স্বল্পবাহিরদিয়ার অশ্বিনীকুমার রাহা মহাশয় আসামে ব্যবসা করিতেন। একদিন তিনি আসাম হইতে আমাকে এই

মর্মে টেলিগ্রাফ করিলেন যে, তিনি গোপাল দর্শনে আসিতেছেন, আমি যেন নির্দিষ্ট দিনে যাত্রাপুর রেলষ্টেসনে উপস্থিত থাকি। আমি নির্দিষ্ট দিনে ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম—বহু ভোগোপকরণ লইয়া অশ্বিনীবাবু সস্ত্রীক ট্রেন হইতে নামিলেন। গোপালবাড়ীতে পৌঁছিবার পর অশ্বিনীবাবু বলিলেন "কিছুদিন পূর্বে আমার আসামের বাসা থেকে কার্যোপলক্ষে প্রায় একশত মাইল দূরে একস্থানে রাত্রে ঘুমাইয়া আছি এমন সময় স্বপ্ন দেখিতেছি—গোপাল আমাকে বলিতেছেন—'আমার গলার হার নাই, আমাকে একগাছা হার করিয়া দেও।' ঠিক সেই রাত্রে আমার আসামের বাসায় স্ত্রীও স্বপ্ন দেখিলেন, 'আমার গলার হার নাই, তোমরা একগাছা হার করিয়া দেও।' স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' উত্তর পাইলেন, 'আমি লাউপালার গোপাল।' স্ত্রী বলিলেন, 'আমিত তোমাকে দেখিনি, কতটুকু হার তোমার দরকার?' তিনি উত্তরে হারের মাপের একটা ধারণাও পাইলেন। এইজন্য আমি হার তৈয়ার করাইয়া ও কিছু ভোগ-সামগ্রী লইয়া এখানে আসিয়াছি।" এইকথা বলিয়া অশ্বিনীবাবু হারগাছি পূজারীর হাতে দিলেন এবং পূজারী তাহা শ্রীগোপালের গলায় পরাইয়া দিলেন।

অশ্বিনীবাবু আরো বলিলেন, "ভোগসামগ্রীর মধ্যে কপি ও পাকা পেঁপে আনার ইচ্ছা আমার ছিল, কিন্তু তাহা পারি নাই, শুনিয়াছি গোপাল সকলের বাসনাই পূরণ করেন, আমার এই বাসনাটুকু কি পূরণ করিবেন না?" এই সকল কথাবার্তার কিছুক্ষণ পরেই চাঁপাতলার এক ব্যক্তি তাঁহার পেঁপেগাছের প্রথম দুটি পাকাফল আনিয়া মন্দিরের বারান্দায় রাখিলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে কার্তিকদিয়ার জগদ্বন্ধু গোস্বামী মহাশয় ভোগের জন্য একটি কপি পাঠাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া অশ্বিনীবাবু আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,

"গোপাল সম্বন্ধে যে সকল আশ্চর্য কথা পূর্বে শুনিয়াছি তাহা সত্যই বটে।"

অশ্বিনীবাবু ইহার পর গোপালসেবার অনেক আনুকূল্য করিয়াছেন।

(৩) উপরে বর্ণিত ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন বিকালে মন্দিরের রকে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন বিধবা মহিলা আসিয়া বাষ্পবিগলিত নেত্রে ও রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিলেন, "পূজারীকে বলুন গোপালকে বাহিরে আনিতে।" তাঁহার ভক্তি-ভাব দেখিয়া আমার অনুরোধে পূজারী গোপালদেবকে রকে আনিলেন। তখন তিনি তাঁহার কাপড়ের আঁচল হইতে দুইগাছা সোনার বালা খুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গোপালের হাতে পরাইয়া দিতে বলিলেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসায় তিনি বলিলেন যে, গোপাল তাঁহাকে ৩।৪ রাত্রি স্বপ্নে বলিয়াছেন তিনি খালি হাতে আছেন, তাঁহাকে সোনার বালা করিয়া দেও। আমি তাঁহাকে মাপের প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর করিলেন, "গোপাল মাপ দিয়াই বলিয়াছেন সত্বর বালা গড়াইয়া দিতে। তাই বালা গড়াইয়া নিয়া আসিয়াছি।"

(৪) 'একদিন খুলনা-যশোহরের ইতিহাস'-লেখক দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, খুলনা-যশোহরের ইতিহাস লিখিবার উদ্দেশ্যে তিনি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য কোধ্‌লা-মঠে যাইবার, কালে যাত্রাপুর-লাউপালার খেয়া পার হওয়ার সময় ভাবিতে-ছিলেন—'গোপাল! এই স্থানে তোমার মহিমার বহু কাহিনী প্রবাদবাক্যের ন্যায় শুনিয়াছি, আজ তোমার মন্দিরে গেলে এই আশ্বিন মাসে অযাচিতভাবে যদি পাকা কাঁঠাল প্রসাদ পাই তবে তোমার মহিমা বুঝিব।' তিনি শ্রীগোপালকে দর্শন ও প্রণাম করিয়াই চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় মোহান্ত তাঁহাকে

প্রসাদ পাইতে বলিয়া প্রসাদ আনিয়া দিলেন। এই প্রসাদের মধ্যে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত প্রচুর পাকা কাঁঠালও ছিল। ইহাতে সতীশবাবু বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া গোপালের অত্যাশ্চর্য অলৌকিক কাহিনীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন।

(৫) আমিরপুরনিবাসী মতিলাল দত্ত মহাশয় বহুদিন যাবৎ লাউপালায় গোপালসেবায় ব্রতী ছিলেন। আশ্বিন মাসের একদিন তিনি মন্দিরে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, 'গোপাল, বালক-দাস বাবাজী প্রকট থাকিতে তুমি কত কি করিয়াছ শুনিয়াছি ; আজ তোমাকে একটি পাকা আম ভোগ দিতে আমার বাসনা জাগিতেছে ; তোমার কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।' এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় লাউপালার মুরারি বৈরাগী আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, গোপালের দীঘিরপাড়ের গাছে একটি বড় আম তিনি দেখিয়া আসিলেন। মুরারির কথা শুনিয়া মতিলাল তাহাকে আমটি পাড়িয়া দিতে বলিলেন। মুরারি তখন দত্ত মহাশয়কে সঙ্গে নিয়া আমটি পাড়িয়া দিলেন। ঐ আমটিকে পরদিন মধ্যাহ্নে ঘন-আটাদুধসহ ভোগে দেওয়া হইল। ওইদিন সকালেই আমি কলিকাতা হইতে ওখানে পৌঁছিয়াছিলাম। পৌঁছিয়াই আমপ্রাপ্তির বিবরণ শুনিয়া ও পরে প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলাম।

(৬) খুলনার দাকুপ থানা এলেকায় লোকনাথ মোড়ল নামে এক সম্পদশালী লোক ছিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের ও উক্ত মতিলাল দত্ত মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় ছিল। একবার আমরা তাঁহার বাড়ীতে শ্রীগোপাল-সেবার জন্য ভিক্ষায় গিয়াছিলাম। সেবারে তিনি আমাদিগকে তাঁহার কাছারীবাটীতে কাহাকেও পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। লোকনাথবাবুর কথানুসারে একদিন আমি দত্তমহাশয়কে তাঁহার কাছারীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করি। দত্তমহাশয় আমার অনুরোধে তথায় যাইবার

উদ্দেশ্যে গোপালবাড়ী হইতে তাঁহার নিজবাড়ী আমিরপুরে যান। বাড়ী পৌঁছিয়া পরদিনই তিনি লোকনাথবাবুর কাছারীবাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেইদিনই বাড়ী ফিরিয়া আসিবার আশায় তিনি অতিভোরে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে চল্‌তি-নৌকার মাঝিদের অনুরোধ করিয়া নদী পার হইতে হয়। লোকনাথবাবুর কাছারী-বাটীতে পৌঁছিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিয়া মতিলাল গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। অনেক পথ। পথে তাঁহার কয়েক-বার দাস্ত হইল। তবুও চলিতেছেন। চলিতে চলিতে সেই নদীতীরে আসিয়া পড়িলেন। আবার পার হইতে হইবে। নৌকার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, দীর্ঘ বাঁকের কোথায়ও কোন নৌকা চোখে পড়ে না। বেলা দ্বিপ্রহর, একে পথশ্রান্তি, তাহাতে দাস্তহেতু শরীর অবসন্নপ্রায়। জনমানব-হীন নির্জন প্রান্তরে হতাশপ্রাণে নদীর তীরে দেহ এলাইয়া মতিলাল 'হা গোপাল! হা গোপাল!' করিতে লাগিলেন। একটু পরেই মতিলাল দেখিলেন, তাঁহার সামনে একখানি ছোট নৌকা আসিয়া ভিড়িল। 'তুমি ওপার যাবে?' নৌকার মাঝি জিজ্ঞাসা করিল। 'হ্যাঁ যাব' বলিয়া মতিলাল নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। পারে গিয়া নামিবার সময় মতিলাল মাঝির দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন, মাঝি একটি বালক—চেহারা সুন্দর।

"তোমার নাম কি, মাঝি?" মাঝি হাসিয়া উত্তর দিল—"আমাকে চেন না? আমার নামত গোপাল।" আনন্দে ও বিস্ময়ে মতিলাল অভিভূত হইলেন, কিন্তু সেই নৌকা ও মাঝিকে আর দেখিতে পাইলেন না।

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীগোপালের সেবক-পরম্পরার বিবরণ

১। শ্রীমদ্ বালকদাস বাবাজী মহারাজ—বাংলা ১১৯০ সালে সেবা গ্রহণ করিয়া অপ্রকট হন ১২৫৯ সালে

২।	মদনমোহনদাস বাবাজী	— বাংলা	১২৫৯	হইতে	১২৬২	সাল
৩।	গোবিন্দদাস বাবাজী	— „	১২৬২	—	১২৬৯	„
৪।	সখিচরণদাস বাবাজী	— „	১২৬৯	—	১৩১৩	„
৫।	দ্বারিকানাথ অধিকারী	— „	১৩১৩	—	১৩২২	„
৬।	শ্রীশ্রীগোপাল মন্দির কমিটী	— „	১৩২২	—বর্তমান	১৩৭০	সাল

পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

উক্ত কমিটী কর্তৃক নিযুক্ত পূজারী-পরম্পরার বিবরণ

১। বিহারীদাস ব্রজবাসী বাবাজী
২। উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী
৩। যতীন্দ্রনাথ রায়
৪। বিহারীদাস ব্রজবাসী
৫। অনিরুদ্ধ দাস বাবাজী
৬। ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৭। বিহারীদাস ব্রজবাসী
৮। মতিলাল চক্রবর্তী
৯। অনিরুদ্ধদাস বাবাজী

পরিদর্শন মন্তব্য

শ্রীশ্রীগোপালমন্দির-কমিটীর সেবার কার্যাদি পরিদর্শন করিয়া বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যে সকল মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সভাপতি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

বৈদ্যুতিক চিকিৎসক ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী (পি. এন্. নন্দী) মহাশয় লিখিয়াছেন:

লাউপালার শ্রীশ্রীগোপালমন্দির-কমিটির ধর্ম্মপ্রাণ ও উৎসাহী সম্পাদক শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের আমন্ত্রণে আমি অদ্য শ্রীশ্রীগোপালমন্দির কমিটীর সাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কার্য্যের শৃঙ্খলতার সহিত সুব্যবস্থাদি দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। এরূপ প্রাচীন মহীয়সী হিন্দুকীর্ত্তি এ প্রদেশে বিরল। আমি প্রায় গত ৫০-৫৫ বৎসরের অধিক কাল এই মন্দিরের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে কমিটি যেরূপ সুব্যবস্থার দ্বারা মন্দিরের সেবাদি কার্য সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইতেছেন, এবং মন্দির সংস্কারাদির জন্য যেরূপ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন তাহা এত দীর্ঘকালের মধ্যেও কোন মোহান্তের দ্বারা হয় নাই।

বাগেরহাটের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ১৯১৫ সালের প্রস্তাবমতে কমিটি স্থানীয় দরিদ্র ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণব ছাত্রদের জন্য শ্রীশ্রীগোপাল বাড়ীতেই একটি অবৈতনিক পাঠশালা খুলিয়াছেন। ইহার দ্বারা অশিক্ষিত বালক বালিকাদের অত্যন্ত উপকার হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। অতিথি-সেবার সুব্যবস্থাদিও কমিটী অতি সুন্দরভাবে করিয়াছেন। ভগ্ন ও পুরাতন মন্দিরের সংস্কার কার্য্য কমিটি সামান্যভাবে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ কার্য্যের জন্য অনুমান ১৫।২০ হাজার টাকার প্রয়োজন। ঐ টাকা সংগ্রহ করিতে পরিলে শ্রীমন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে সংস্কার হইতে পারে। আশা করি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জনসাধারণের সহানুভূতিতে কমিটী এই মহৎ কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিয়া খুলনার নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন। বাংলা দেশের দেব-মন্দিরসমূহ যদি এইভাবে ও এই আদর্শে পরিচালিত হয় তবে দেশের মহদুপকার সাধিত হইতে পারে।

লাউপালা গ্রামটী বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার চতুষ্পার্শ্বে নদী থাকায় এবং এই গ্রামটি অন্যান্য গ্রাম হইতে সমুন্নত থাকায় খুলনা জেলার মধ্যে এমন্ কি নিকটবর্ত্তী অনেক জেলার মধ্যেও স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

গত একশত বৎসরের মধ্যেও এখানে কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি শ্রীশ্রীগোপালের কৃপায় হয় নাই। এ স্থানটী কেবলমাত্র যে স্বাস্থ্যকর তাহা নহে, ইহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেরও লীলাভূমি। এই স্থানটী দর্শন করিলে পৌরাণিক আশ্রমের স্মৃতি হৃদয়ে উদিত হয়।

কমিটী নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের সংকল্প করিয়াছেন জানিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আশা করি, অতি সত্বর তাঁহাদের সংকল্পিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা দেশের মহদুপকার সাধিত করিতে সমর্থ হইবেন।

(স্বাঃ) শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী

২৯শে অক্টোবর, ১৯২১

বাগেরহাট কলেজের খ্যাতনামা জনপ্রিয় ও সুযোগ্য অধ্যক্ষ কামাখ্যা চরণ নাগ, এম্-এ মহাশয় লিখিয়াছেন :

বাগেরহাট মহকুমার প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির মধ্যে সিদ্ধভক্ত বাবা বালক দাস প্রতিষ্ঠিত "লাউপালার গোপালবাড়ী" চিরপ্রসিদ্ধ। লাউপালা একটী ক্ষুদ্র বৈষ্ণব উপনিবেশ—বর্ত্তমানে ভৈরবের ক্রোড়ে একটী দ্বীপরূপে প্রতীয়মান। বহু ভদ্রগ্রাম দ্বারা উহা পরিবেষ্টিত এবং জনকোলাহলবর্জিত ও স্বাস্থ্যকর। এইরূপ স্থানই সাধনার অনুকূল। কালের কঠোর তাড়নায় লাউপালার এই মনোরম আশ্রমটী নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু আনন্দের বিষয় গত কয়েক বৎসর যাবৎ উহার তত্ত্বাবধানের ভার কতিপয় উদ্যমশীল ও ধর্ম্মপ্রাণ বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান দ্বারা সংগঠিত একটী সমিতির উপর ন্যস্ত হওয়ায় আবার উহা পূর্ব্বের ন্যায় শান্তি-নিকেতন হইয়া উঠিতেছে। আমি গোপালবাড়ী ইতিমধ্যে কয়েকবার গিয়াছি। ৺গোপালের নিত্যসেবার জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি থাকিলেও তাহা একরূপ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছিল। আশ্রমের দেবমন্দির, অতিথিশালা ও অন্যান্য গৃহগুলি জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অধুনা সমিতির সভাপতি ঘাটভোগের বিখ্যাত ভক্ত জমিদার শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক বাগেরহাটের সবওভারশিয়ার কুমারব্রতচারী গোপালৈকপ্রাণ শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের যত্নে ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমে ৺গোপালের সম্পত্তি পুনরায় দেবসেবায় নিয়োজিত হইতেছে ও গৃহাদি সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। উৎসবাদি উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হওয়ায় আশ্রমের আয় ও ব্যয় বহু পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আশ্রমের সহিত সকল প্রকার

বিদ্যার্জ্জনের ব্যবস্থা হইতেছে। ভক্তিধর্ম্মের পুনঃ প্রচারের জন্য ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থাও একরূপ সংকল্পিত। সমিতি বৃথা বাগাড়ম্বরে সময়ক্ষেপ না করিয়া নীরবে কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটীকে সময়োপযোগী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে হইলে এখনও বহু অর্থের প্রয়োজন। উপযুক্ত কর্ম্মী পাওয়া গিয়াছে। আশাকরি অচিরে ৺গোপালের কৃপায় তাঁহার ভক্তগণের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইবে। ইতি ১৭ই আশ্বিন, ১৩৩০ সাল।

(স্বাঃ) শ্রীকামাখ্যাচরণ নাগ, প্রিন্সিপাল,
বাগেরহাট কলেজ।

বাগেরহাটের সুযোগ্য সব-ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট হরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ

It is gratifying to note the improvements that have been effected in the management since the constitution of the new committee. I visited the holy place during the Ratha festival last year, and saw for myself all the arrangements that had been made. They were highly satisfactory. The new committee have taken up in right earnestness the improvement of the buildings and have, within so short a time, already made some repairs. Money is needed, and I do hope that with the earnestness of the new committee the public purse would be unloosened.

(Sd.) *H. Dutta*, S.D.O.
Bagerhat, 9. 10. 23.

অশেষশাস্ত্র-পারদর্শী বাংলার স্বনামধন্য স্পষ্টবক্তা কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, বি-এ, ভাগবতরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ

খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমার অধীন লাউপালা গ্রামে শ্রীশ্রীগোপালজীউর মন্দির বাংলাদেশের একটী দর্শনীয় মন্দির। এই মন্দিরে রথযাত্রার মেলা হয়। উহাতে বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। সিদ্ধ মহাত্মা বালকদাসের নাম খুলনা-বরিশাল অঞ্চলের ভক্তগণের নিকট সুপরিচিত। এই মন্দিরে সেই মহাত্মার সমাধি আছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন এই মন্দির পরিদর্শন করিতে যাই তখন মন্দিরের অবস্থা অতি

খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর মন্দিরের উন্নতি সাধনের জন্ত ও পরিচালনের জন্য একটী কমিটী গঠিত হয়। উচ্চপদস্থ স্থানীয় রাজকর্মচারিগণ এই কমিটীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই কমিটীর চেষ্টায় অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মন্দিরের সম্পত্তি উদ্ধার করা হইয়াছে। এবার বর্ষাকালে জন্মাষ্টমীর পর গিয়া দেখিলাম মন্দির মেরামত হইতেছে। কাজ অনেক দূর হইয়াছে। সম্পত্তির সুব্যবস্থা হইয়াছে। রীতিমত অফিস বসিয়াছে। সাধারণের সম্পত্তির হিসাব যেমন ভাবে রাখা উচিত ঠিক তেমনি ভাবেই রাখা হইতেছে। আমি আগাগোড়া সমুদয় ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। দরিদ্র বালক-বালিকাদিগের জন্য একটা বিদ্যালয় বসিয়াছে। সেখানে সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত শিল্পশিক্ষা দেওয়া হইতেছে। একটী গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। চতুষ্পাঠী বসিয়াছে। অসহায় দরিদ্রকে অন্নদান, ঔষধ পথ্য দান প্রভৃতির ব্যবস্থাও হইতেছে। মন্দির যে এই প্রকারের হওয়া উচিত, তাহা আমি প্রাচীন শাস্ত্রের প্রমাণ সহ অনেক স্থানে বলিয়াছি। "দানতত্ত্ব" নামক একখানি গ্রন্থ ছাপাইয়াও এই কথা প্রচার করা হইয়াছে। এতদিন পরে দেখিলাম, একটী প্রকৃত বিষ্ণুমন্দির গড়িয়া উঠিতেছে। পরম কল্যাণভাজন শ্রীমান শ্রীউপেন্দ্র নাথ কর কমিটীর সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার সমস্ত অর্থ ও সামর্থ্য শ্রীশ্রীগোপালের সেবায় অর্পণ করিয়াছেন। তিনি ও অন্যান্য অনেক ধর্মপ্রাণ ও চিন্তাশীল সাধু ব্যক্তির পরিশ্রমে এই সৎকার্য সাধিত হইতেছে। বাংলাদেশের প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ হিন্দুর এই মন্দির উদ্ধারের সংবাদ রাখা উচিত। আর যাঁহাদের সময় ও সুবিধা আছে তাঁহাদের প্রত্যেকের এই তীর্থস্থান দর্শন করা উচিত। সিদ্ধ মহাত্মা বালকদাসের সেবিত এই শ্রীশ্রীগোপালবিগ্রহ দর্শন করা, মহাত্মার সমাধিস্থান দর্শন করা উচিত। অন্যান্য দেবস্থানগুলি এইভাবে উদ্ধারলাভ করিলে আমাদের জাতির পরম কল্যাণ হইবে। ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

লক্ষ্মীপূর্ণিমা, ১৩৩০

স্বদেশহিতৈষী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সুবোধকুমার দে (Mr. S. K. Day, A.S. A. A. Incorporated Accountant, London, Lecturer, Calcutta University.) মহাশয় লিখিয়াছেন:

আমাদের দেশে বিশেষতঃ বাংলাদেশের সর্ব্বত্র দেখতে পাই, প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরসকল মেরামতের অভাবে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। লাউপালার শ্রীশ্রীগোপালের বাড়ী বড়ই খারাপ অবস্থায় ছিল। শ্রীগোপাল মন্দির কমিটীর সম্পাদক পরমভক্ত শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের একনিষ্ঠ চেষ্টায় ঐ মন্দির এখন ভালভাবে মেরামতের চেষ্টা হইতেছে, এবং অনেকটা হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার মনে আশার উদয় হইয়াছে। হিন্দু-ধর্ম্মের পুরাতন ভাব জাগরিত করিতে হইলে হিন্দু দেবদেবীর পূজা পূর্ব্বের মত করা উচিত। বহুদেশ বেড়াইয়া দেখিয়াছি যে অনেকে নানাবিধ শিক্ষালাভ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মে সেরূপ অনুরাগ বা আস্থা নাই বলিয়া তাহাদের সকল শিক্ষা ব্যর্থ হইয়া তাহারা পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করিতেছে। দেশের প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা জাতীয় জীবন গঠিত করিতে হইলে ধর্ম্মই তাহার মূলভিত্তি হওয়া আবশ্যক। শ্রীশ্রীগোপালবাড়ী আমাদের দেশের একটী প্রাচীন কীর্ত্তি ও ধর্ম্মশিক্ষার কেন্দ্রস্থান। ইহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধন করিতে পারিলে আমাদের দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। ইহার উন্নতি ও সৌষ্ঠব সাধনের জন্য এতদ্দেশের প্রত্যেকের যত্নবান হওয়া উচিত।

শ্রীগোপালমন্দির-কমিটীর নিঃস্বার্থ ও ঐকান্তিক কার্য্যে আমি নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতেছি। নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার, মন্দির সংস্কার, আশ্রম স্থাপন ও কীর্ত্তনাদি প্রচার, কমিটীর কার্য্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীমন্দিরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহা ভালভাবে রাখা হইতেছে। জমা ও খরচের এরূপ নিখুঁত হিসাব অনেক কারবারী দোকানেও রাখা হয় না। প্রার্থনা করি, শ্রীশ্রীগোপালের কৃপায় সমিতির সকল চেষ্টা সফল হউক।

(স্বাঃ) সেবকাধম শ্রীসুবোধকুমার দে
(S. K. Dey)

বাগেরহাটের সুযোগ্য পুলিশ ইনেস্‌পেক্টর রঙ্গীনলাল ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন :

The holy temple of Gopal Jew at Lowpala in the Bagerhat sub-division of Khulna district, Bengal, is an old relic of

the Vaishnava religion and has a history of its own, well-known to the followers of the Lord Gouranga, the great Apostle of the religion. The temple had its day while it was under the management of its great devotee Mohanta Balakdas Babaji with whose name the history of this temple has so long been associated and will remain so for ever.

It is a pity that after this Mohanta's time, the management of the temple was neglected, and as usual with the other old Hindu shrines of Bengal, this temple was also going to be a ruin but it is a great pleasure to note that through earnest efforts of the present committee under the able management of its President Babu Trailokya Nath Chatterjee of Ghatbhog and through the indefatigable energy and devotion of its present secretary Babu Upendra Nath Kar. D.B. Overseer, Bagerhat, the lost story of this great holy Hindu temple is going to the restored through the grace of Gopal Jew.

It was to my great luck, I had an opportunity to visit this holy temple during the last Rathajatra festival and was simply surprised to find that within a few years of the able management of the present committee, there have been effected much commendable improvements of the Temple regarding its repairs and internal management. The committee, it is gratifying to note is composed of members, who are all men of religious soul and are stunch devotees of the Diety of the Temple. They are all working in right earnest to restore the lost glory of the Temple and have really been working with a religious spirit with the sole object of effecting all possible improvements to the Temple in all matters relating to it such as repairs to exerting buildings, establishment of religious and educational institutions etc.

It is extremely satisfactrory to note that the committee has been keeping a very henest and up-to-date account of the Temple-funds with which it is entrusted in a systematic way, and has, no doubt, done some repairs to the temple

buildings with the funds available, but there is much left in this respect to be done and which is essentially necessary.

The present income of the Temple is not at all sufficient to meet the great expenses which is absolutely needed to effect the necessary improvements such as repairs etc. The sympathy of the religious Hindu public, is therefore wanted to meet the required funds for the much needed improvements of the Holy Temple, and it is hoped that the religious public, who, I believe, have already been much impressed with the work of the present committee and have by this time got sufficient grounds to repose their implicit trust in it, should now come forward to meet the necessary funds for the improvement of the Temple.

The committee just after its first management of the Temple, had some trouble some days as they had to face some strong obstacles from certain influencial quarters in the path of this noble cause being entangled in some civil and criminal cases but through the grace of the Lord—the Gopal Jew for whose cause the committee was embarrassed in this way—all those obstacles have since been removed, and it is hoped that the committee will now have its free field of work to achieve their success towards all desirable improvements of the Temple and I wish and pray that the present committee will be a great success in the near future.

(Sd.) R. N. Ghosh.
Insp. of Police,
Bagerhat. 20.1.24.

শিক্ষকশ্রেষ্ঠ রজনীকান্ত মিত্র বি. এ. মহাশয় লিখিয়াছেন :

Lowpala is one of the most holy places in Bengal containing a temple of Sri Gopal Jew. The great devotee Balakdas Babaji consecrated his holy life in the service of Sri Gopal Jew here and gave an added charm to the place by his remarkable piety and devotion. The place is visited by many pilgrims who derives spiritual consolation by a 'darsan' of Gopal Thakur and paying tribute to the sacred

memory of the great saint Balakdas Babaji who has his holy remains buried near the temple. Both the temple of Sri Gopal Jew and the tomb of the Babaji have a special charm for the Hindus. These require to be carefully protected and the festival of Rathajatra that is annually held here should continue as a parmanent institution as it is. The management of the holy temple, the protection of the tomb and the conduct and supervision of the Mela so long rested in private hands. This is not desirable and I am glad that a strong committee have taken over the entire management of this holy affair. I have been much impressed with the working of the new committee who have, during the short time that they have taken charge, effected considerable improvements in matters of repair and conduct of the famous Ratha festival. The income of the mandir and the festival is entirely devoted to the service of Gopal, only a very small portion being used for establishments. I wish all success to the committee in their admirable effort to restore this ancient temple to its former glory.

I have looked into the accounts of the committee and have been agreeably surprised at the honesty and diligence with which they are kept. I suggest the accounts may be annually published to attract more public attention.

I cannot close my observations without a greatful reference to the personnel of the present committee which is presided over by the indefatigable worker Babu Triolakya Nath Chatterjee and guided under the pious inspiration of my affectionate friend Babu Upendra Nath Kar, who has dedicated his life in the service of Lord Gouranga and in popularising His holy name.

(Sd) Rajani Kanta Mitra B.A. President,
Naldha Moubhog Union Board, and Hony.,
Magistrate, Bagerhat. 1. 11. 23.

খুলনার সুপ্রসিদ্ধ উকিল শরচ্চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন :

বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত লাউপালা গ্রামে অবস্থিত ৺শ্রীশ্রীগোপাল

দেবের বিগ্রহ ও মন্দির একটি প্রাচীন কীর্ত্তি। ইহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু ও ভক্তগণের সমাগমস্থল ছিল। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান ম্যানেজিং কমিটী বিশেষতঃ ইহার অক্লান্ত কর্ম্মী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কর মহাশয় ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। মন্দির ও অতিথিশালা প্রভৃতি সংস্কার ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে ইঁহারা অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন; কিন্তু এখনও মন্দির সংলগ্ন নাট-মন্দিরটী সংস্কার করা হয় নাই। এই কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিতে হইলে অনেক অর্থব্যয়ের আবশ্যক। আশা করি সকলেই স্বীয় স্বীয় অবস্থানুসারে অর্থ সাহায্য করিয়া যাহাতে এই কার্য্যটী সুসম্পন্ন হয় তাহা করিয়া দেশের ও দশের ধন্যবাদভাজন হইবেন। ইতি—১৩৪০ সাল, ১৪ই অগ্রহায়ণ।

(স্বাঃ) শ্রীশরচ্চন্দ্র দাশগুপ্ত

বাগেরহাটের ভূতপূর্ব্ব সব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ

I visited Lowpala Gopalji temple recently and was pleased to see the arrangements there. The improvement, I am glad to say, are entirely due to the devotion and untiring energy of the Secretary Babu Upendra Nath Kar.

(Sd) P. B. Chakraborty.
Second Officer.
24. 12. 23 Bagerhat.

বাগেরহাটের সুযোগ্য মুনসেফ ধীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় লিখিয়াছেন :

বিগত রথযাত্রা উপলক্ষে আমরা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ লাউপালার ৺গোপালজীউ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। উক্ত দেবসেবাদি কার্য্য ও মন্দিরের সংস্কার এক কমিটীর উপর ন্যস্ত আছে। উক্ত কমিটী মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার ও সদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত। যাহা দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় কার্য্য ভালরূপ হইতেছে। কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ কর মহাশয় অক্লান্তকর্ম্মী ও বিশেষ চেষ্টাবান। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু এ সকল সৎকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন জন্য অর্থাভাব হইতেছে। জনসাধারণের অর্থ

সাহায্য আবশ্যক এবং যে কেহ এই উদ্দেশ্যে দান করিবেন, তাহা সৎকার্য্যেই দান হইবে, সন্দেহ নাই।

(স্বাঃ) শ্রীতেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মুন্সেফ, বাগেরহাট
১৩৩০।১৮ই মাঘ।

(স্বাঃ) শ্রীধীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়,
মুনসেফ, বাগেরহাট।
১৩৩০ সাল— ১৮ই মাঘ।

খুলনার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও পাবলিক ওয়ার্কস-ডিপার্টমেণ্টে হিজলী ডিভিসনের একজিকিউটীভ ইঞ্জিনিয়ার, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রসিকলাল হুই বি.এ. বি.ই. মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ

I have had occasion to visit the holy place of Lowpala to have a 'darsan' of Sri Sri Gopal Jew. I was very pleased to see that the old and dilapidated temple had been already greatly repaired and improved by the committee of devoted works who have taken over management of affairs of the temple and other connected institutions. Much however remains to be done and a large amount of money is yet required for the purpose. I have no doubt that every religious-minded Hindu will come-forward with a generous contribution towards the noble end.

(Sd) R. L. Hui
Executive Engineer
Hijli Dv. P. W. D.
23. 4. 24.

খুলনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ জনপ্রিয় ও ধর্ম্মপ্রাণ উকিল নগেন্দ্রনাথ সেন, বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী ও বাবু সুরেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়গণ লিখিয়াছেন ঃ

আমরা রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপাট লাউপালায় আগমন করিয়া যাহা দর্শন করিলাম, তাহাতে পরম সন্তোষলাভ করা গেল। দেবসেবার সুবন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং রথযাত্রার মেলা উপলক্ষে ও অন্যান্য যে সমস্ত আয় হয় তাহার ব্যয়ের যে ব্যবস্থা তাহা অতি সুন্দর। কোন অপব্যয় দৃষ্টিগোচর হয় না, আয় ব্যয়ের হিসাব অতি সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইতেছে। এই সমস্ত সুবন্দোবস্ত সম্বন্ধে কমিটীর পক্ষ হইতে শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ কর, শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তস্য পুত্র প্রভৃতি অগ্রণী হইয়া

বিশেষ আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতেছেন। দেবসেবাদি কার্য্য বর্ণাশ্রমবিহিত পদ্ধতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া সম্পন্ন হইতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই বার্ষিক মেলার সংস্রবে যে একটী কুনিয়ম চলিয়া আসিতেছিল তাহাও কমিটীর তত্ত্বাবধানে ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিতেছে এবং কমিটীর কার্য্যদর্শিগণ অনতিবিলম্বে উহা দূর করিতে পারিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং আমরাও তাহা বিশ্বাস করিতে পারি। এ প্রদেশে এইটী একটী প্রাচীনকালের প্রতিষ্ঠিত দেবতাস্থল। ধর্ম্মপিপাসু হিন্দুসমাজের একটী প্রধান তীর্থস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা এই দেবস্থলীর ক্রমিক উন্নতি দর্শন করিয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিতেছি, ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ সংরক্ষণের প্রতি হিন্দুবর্গের বিশেষ শিক্ষিত মণ্ডলীর আন্তরিক লক্ষ্য হয় ইহা ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

এই দেবমন্দির সংশ্লিষ্ট নাটমন্দির ও সন্নিহিত পুষ্করিণীটীর উপযুক্ত সংস্কার হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন। কমিটীপক্ষ হইতে যে বার্ষিক অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহা হইতে অত্যাবশ্যকীয় নিত্য ব্যয় ও মেলা উপলক্ষে আবশ্যকীয় ব্যয় বাদ দিলে এই সংস্কার কার্য সুসিদ্ধ হওয়া সুকঠিন। সুতরাং সাধারণ হিন্দু-মণ্ডলীর এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। কমিটীপক্ষ হইতে সাধারণ হিন্দুগণের নিকট এই অভাব সম্বন্ধে আবেদন করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং জেলা বোর্ডের নিকট সমস্ত অবস্থা প্রকাশ করিয়া জলাশয়টী সংস্কারর প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

(স্বাক্ষর) শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী, খুলনা
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন ,,
শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত ,,
৩০শে আষাঢ়, ১৩৩১।

বাংলার বিখ্যাত শাস্ত্রব্যাখ্যাতা শ্রীমদদ্বৈত বংশীয় প্রভুপাদ রাধা-বিনোদ গোস্বামী মহোদয় এই আশ্রম দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন :

প্রভু সীতানাথের অপার কৃপায় আজ খুলনা জেলার অন্তর্গত লাউপালা গ্রামে সিদ্ধ বালকদাস বাবাজী মহারাজের সেবিত শ্রীশ্রীগোপাল দেবের আতিথ্য গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া পরম কৃতার্থতা অনুভব করিতেছি। স্থানটী অতি মনোরম এবং ভক্তগণের ভক্তি রসোদ্দীপক। শ্রীমন্দিরের

চতুঃপার্শ্ববর্তী ভূভাগ এবং বৃক্ষরাজি দেখিলে প্রকৃতই প্রাকৃত মনের একটি অভাবনীয় পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হয়। মন্দিরের সেবক এবং পরিদর্শকবৃন্দ পরম শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে শ্রীশ্রীগোপাল দেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাদের ভাব ও সেবাকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়। কিন্তু শ্রীশ্রীগোপাল দেবের কি ইচ্ছা জানি না—তাঁহার নাটমন্দির, অতিথিশালা, ভোগমন্দির, বৈষ্ণবাবাস, ভাণ্ডার-গৃহ রথ প্রভৃতি অতি জীর্ণ এবং পতনোন্মুখ; সহৃদয় ভক্তগণের এ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে একটি প্রাচীন পবিত্র কীর্ত্তি রক্ষা হয়। শ্রীশ্রীগোপাল দেবের চরণে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহার ভক্তগণের অন্তরে প্রেরণা জাগাইয়া তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া দর্শক ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। কিমধিকমিতি—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তদাসানুদাস
স্বাঃ শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী
শ্রীধাম শান্তিপুর

১৪ই ভাদ্র, শুক্রবার —১৩৩৬

বাগেরহাটের সুযোগ্য জনপ্রিয় সব-ডিভিশনাল অফিসার রায় সুরেশ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর এই আশ্রম পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন :

আমি বাগেরহাট থাকার সময় লাউপালার গোপাল-মন্দির পরিদর্শন করিয়াছি। প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অবস্থা কমিটীর তত্ত্বাবধানে আশাপ্রদ কিন্তু জীর্ণ সংস্কার ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সংস্কারাদি এখনও যথেষ্ট করিবার রহিয়াছে। এই সকল শুভ অনুষ্ঠানে আমার যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বদলির জন্য কিছু করিতে পারি নাই; সুতরাং আমার পরবর্ত্তীর উপর এই কার্য্যভার দিয়াই আমাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল, ভরসা গোপালের কাজ গোপালই করিবেন।

শ্রীযুত ত্রৈলোক্যবাবু ও উপেনবাবুই এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, এবং তাঁহাদের সহকারিতায় ইহার কাজ সুসাধ্য হইবে।

২৯।৬।২৯ স্বাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহশর্ম্মা

বাগেরহাটের ধর্ম্মপ্রাণ সুযোগ্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বগলাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহোদয় আশ্রম দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন :

লাউপালার ৺গোপাল মন্দির একটী পুরাতন ঠাকুরবাড়ী। স্থানীয়

কয়েকজন ভক্ত এই মন্দিরের ভার গ্রহণ করিয়া ৺ঠাকুরের ভোগ ও পূজার বন্দোবস্ত যথাসাধ্য করিয়াছেন, কিন্তু মন্দিরের সংস্কারকার্য্য অর্থাভাবে আশানুরূপ করিতে পারেন নাই। স্থানীয় জনসাধারণ ইচ্ছা করিলে চাঁদা তুলিয়া অনায়াসেই এই কাজ করিতে পারেন। আর কোন বদান্য ব্যক্তি যদি অর্থসাহায্য দ্বারা মন্দির সংস্কার করিয়া দেন, তবে তিনি সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ পাইবেন। ভগবানের কৃপায় এই কাজ সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করি।

স্বাঃ শ্রীবগলাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী,
সব-ডিভিসনাল অফিসার
বাগেরহাট, ৭।২।২৯

বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন ঃ

বিগত ১৩ই আশ্বিন শুক্রবার কয়েকজন বন্ধুসহ ভক্তপ্রবর বালকদাস বাবাজির সাধনধাম লাউপালার সুপ্রসিদ্ধ গোপালবাড়ী দেখিতে গিয়াছিলাম। বাবাজির প্রতিষ্ঠিত এই পুণ্যধাম তাঁহার অসামান্য জীবনীর স্মৃতি বহন করিয়া এদেশের আপামর সাধারণের নিকট বহুদিন হইতে আকর্ষণের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপালজির বিগ্রহ ও মন্দির দর্শন করিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে সাধুভক্তগণের সমাগম হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে এই স্থান বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। রথযাত্রা উপলক্ষে প্রায় ১০০ বৎসর ধরিয়া একটি মেলা হইয়া থাকে। এই মেলার ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ ও বৃহৎ মেলা এতদঞ্চলে আর নাই। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই মেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এখনও তাহার স্মৃতি আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ৫০ বৎসরের মধ্যে এই পুণ্যভূমির যথেষ্ট দুর্গতি ঘটিয়াছিল। অক্লান্তকর্ম্মী তপোনিষ্ঠ চিরকুমার ভক্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ করের আপ্রাণ চেষ্টায় এই ক্ষেত্রটি স্থানীয় জমিদারের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছে ও ইহা হৃতগৌরব পুনর্লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও তীক্ষ্নবুদ্ধি প্রভাবের দ্বারা তিনি জমিদার কর্ম্মচারিগণের কৌশলজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

বাঙ্গালাদেশে কত শত তীর্থস্থান ও দেবসম্পত্তি যে এইরূপ জমিদার ও মোহান্ত-গণের কবলে পড়িয়া তাহাদের সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতেছে তাহার সংখ্যা কে করিবে? এই সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য এই উপেনবাবুর ন্যায় বীরহৃদয় একনিষ্ঠ কর্ম্মীর একান্ত আবশ্যক। কতদিনে যে বাঙ্গলায় সাধুসজ্জন কর্ম্মীগণের চেষ্টার ফলে সাধনপীঠস্থানগুলি কলুষবর্জ্জিত আদর্শ ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইবে তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন।

জমিদারের কবল হইতে দেবসম্পত্তি উদ্ধার করিতে ও গোপালবাড়ীর অত্যাবশ্যকীয় জীর্ণসংস্কার করিতে ও আবশ্যকীয় জমি সংগ্রহ করিতে উপেন্দ্র বাবু প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। উপেন্দ্রবাবু একজন অসাধারণ কর্ম্মী সন্দেহ নাই। তাহা হইলেও তাহার চাকুরীর কঠিন কর্ত্তব্য সম্পাদনের মধ্যে অল্প অবসর সময়ে এই দরিদ্র অঞ্চলে কিরূপে যে তিনি এত অধিক অর্থ সংগ্রহ করিলেন তাহা আমার ধারণার অতীত। তাঁহার সমুদায় প্রচেষ্টা ভগবদ্ভক্তি হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে, তাহাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। উপেন্দ্রবাবু এতদিনে ও এত পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে তাহার পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু তাহার কল্পনা সম্পূর্ণ কার্য্যে পরিণত করিতে এখনও বহু অর্থের প্রয়োজন। উপেন্দ্রবাবু শুধু ভক্ত নহেন, শুধু কর্ম্মীও নহেন, তিনি একজন ভক্তকর্ম্মী। সুতরাং তিনি শুধু গোপাল বিগ্রহের সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি এখানে সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্য চতুষ্পাঠী, বালকদিগের শিক্ষার জন্য পাঠশালা, নৈশ বিদ্যালয়, বয়নবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন শ্রমবিদ্যালয়, আয়ুর্ব্বেদবিদ্যালয়, ভেষজ-উদ্যান, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, গোপালন জন্য গোচারণ-ভূমি প্রভৃতি স্থাপনের আয়োজনে নিযুক্ত আছেন এবং কিছুদূর অগ্রসরও হইয়াছেন। এরূপ দরিদ্র অঞ্চলে এরূপ বহুব্যয়সাপেক্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিকল্পনা আকাশকুসুম বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তিনি যাহা ইতঃপূর্ব্বে সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে এ আয়োজন তিনি পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

লাউপালার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়। এই ক্ষুদ্র স্থানটী চতুর্দ্দিকে নদীদ্বারা বেষ্টিত, সহজেই উর্ব্বরা ও অত্যাশ্চর্য্য শ্রীসম্পন্ন। তাহার উপর ভক্তের সাধনার গৌরবে মহিমান্বিত। আমি একান্ত মনে ইহার

উন্নতি কামনা করি, সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সাফল্য প্রার্থনা করি। কিন্তু এই অনুষ্ঠান আমাদের ন্যায় দেহাত্মবুদ্ধি, সাধনাবর্জ্জিত সামান্য মানুষের শুভেচ্ছা বা প্রার্থনার অপেক্ষা রাখে না। শ্রীভগবানের কৃপায় ইহা আপন গৌরবে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইতি—মূলঘর, ১৬ই আশ্বিন, সোমবার। শ্রীনেপালচন্দ্র রায়

Inspection remarks of Sri R. N. Chatterjee S.D.O., Bagerhat on 4. 10. 33

I have very little to add to the history of the temple of Sree Sree Gopal Jiu which has been recorded by previous visitors. I endorse every word of the glowing encomium bestowed by Babu Nepal Chandra Roy of Santiniketan (Bolepur) on and his reference to piety and devotion of Babu Upendra Nath Kar, the worthy Secretary of the Temple Committee. To his exertions the present position of the temple is due. It is he who has assisted in the establishment of various institutions attached to the temple—a Chatuspathy, a Primary school for boys and girls and a Night school for children of labouring classes.

As one who has seen the temple on various occasions and is acquainted in some measure with the organisation by which the temple and attached institutions are managed, I wish to place on record certain matters in respect of which I would request the assistance and co-operation of my successor.

1. The temple itself should be thoroughly repaired and colourwashed. The floor should be paved with marble.

2. The Natmandir is in a tumble down condition. A very large number of pilgrims is housed in the Natmandir during the Rath Mela. For their safety, the whole structure should be overhauled. That no accident has occured so far is due to the infinite mercy of Gopal for whose worship pilgrims congregate in hundreds.

3. Steps should be taken for securing a suitable grant

for the Chatuspathy. Some of the students of this Chatuspathy intend to qualify as Kabirajes. Babu Upendra Nalh Kar is endeavouring to grow a garden of Ayurvedic herbs.

Lastly the Secretary has incurred debt in acquiring lands adjoining the temple and in its immediate vicinity. The acquisition was necessary in the interests of the temple. The Temple Committee should pool its resources and if necessary appeal for public help to liquidate the debt.

I have by no means exhausted the requirements of the temple. I have only mentioned some of them on the order of urgency. Money will be required. But I have no doubt that every Hindu with the slightest spark of religious feeling will contribute according to his ability If resolute effort is made, if an appeal is circulated not only amongst residents of this subdivision but amongst the larger public outside it, if the history of the temple and its present needs are told, necessary funds will with the grace of Gopal be forthcoming. As one of my predecessors has remarked "Gopal will Himself provide for His requirements." On our part the one thing needful is persistent endeavour.

During the fairly long period I have been at Bagerhat, I visited the temple often on festive occasions and at other times. The natural scenery is most attractive. In fact I cannot imagine a place more suitable for quiet meditation. Removed from the noise and bustle of a town, surrounded by rivulets and gardens with all its associations sanctified by antiquity and the pious memory of Balakdas Babaji, the founder of the temple, one cannot wish for a better place for prayer and devotion.

On the eve of my departure from the Subdivision, I may be permitted to express the hope that no stone will be left unturned in removing the wants I have mentioned of in placing the temple on a sound basis. The works of Babus Upendranath Kar and Amritalal Mitter are beyond all praise. I thank them from the core of my heart. But the public should realise their limitation and give them all the assistance

they require. I have tried to help them in my humble way. But now I am going away. I pray to God that He may guide and bless their labours.

(Sd) R. N. Chatterjee,
S.D.O., Bagerhat
4. 10. 33.

সীতানাথ চক্রবর্ত্তী গোপালমন্দির-কমিটীর সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ করের নামে খুলনার সাব্‌জজ কোর্টে ১৯২৪ সালের ৭৫নং মোকদ্দমা দায়ের করিয়া তাহাতে পরাজিত হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করেন। গোপাল-মন্দির-কমিটীর সভার মন্তব্য বহি (যাহা সাব্‌জজকোর্টে বিবাদীপক্ষে দাখিল করা হইয়াছিল) হাইকোর্ট কর্ত্তৃক পেপার বুকে মুদ্রিত হয়। শ্রীশ্রীগোপাল-জীউর সেবাদি রক্ষা ও পরিচালনার জন্য গোপালমন্দির-কমিটীর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার নিয়মাবলী সম্বন্ধে অবগতির জন্য হাইকোর্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত উক্ত মন্তব্যবহির কয়েকটী সভার বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ইং ১৯১৫ সালে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সুকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রথম

সভার অধিবেশন

From High Court Paper Book page 53

Ex. B.—Minute Book of the Lawpala Gopal Mandir Commiitee, dated from 24th October, 1915.

We went to Laupala on the 12th October last. Babu Bipin Behari Basu, Vice-Chairman of the Local Board, the President Panchait Pandit Bipin Behari Bhattacharyya and many local gentlemen were present there. It is unanimously settled that a Committee consisting of the following gentlemen will be formed for the management of the work of the mandir (temple).

1. Babu Bipin Behari Basu, Muktear, 2. Pandit Bipin Behari Bhattacharyya, President Panchait, 3. The Principal officer of the kutchery at Jatrapur of the Gobardanga estate (at present Dharanidhar Ghosh), 4. Babu Upendranath Kar, Sub-Overseer, Local Board.

This Committee will every year in the month of Baisakh

prepare the budget of the income and the expenditure of the temple. The Mohant shall not be competent to spend money in excess of the amounts set down in the said budget. All the members meeting together at the place will publicly let out the trees standing on the land adjoining the temple. And on the conclusion of the fair on the occasion of the Rath Jatra festival, the members will take account of the income and expenditure from the Mohant, and lay out the balance. The money that will remain as surplus after defraying the expenses of the daily *seba* and *puja* etc. of Gopaldeb will be applied to the repair of the temple. Now a sum of Rs 200 is with the *naib* of the kutchery and the Zemindar Babu have agreed to pay Rs. 200. A sum of about Rs. 180 is with the Nazir Babu of this office. With this sum of Rs. 580 the repairs that are urgently needed will be made. Some works have been done, the balance will also be applied in this way under the supervision of the committee.

It is further settled that a school will be established at the *Natyamandir* (music hall) and for this purpose a sum of Rs.4 per month out of the temple fund will be paid as grant in aid.

(Sd) Sukumar Chattopadhyaya,
Sub-Divisional Officer,
Bagerhat.

24th October, 1915

P.S.—If necessary the members will take the advice of the Sub-Divisional Officer.

(Sd) Sukumar Chattopadhyaya
24.10.15.

From High Court Paper Book Pages 54, 55.

"The second meeting of the committee of the Sree Sree Laupala Gopal Mandir held on the 5th December, 1915.

Chairman—Babu Susil Chandra Ghosh
Sub-Divisional Officer

Names of the gentlemen present :

Babu Susil Chandra Ghosh, Sub-Divisional Officer, Babu Harish Chandra Sarkar, Sub-Deputy Magistrate, Bagerhat, Babu Rabindra Nath Dhar, 1st Munsiff, Bagerhat, Babu Bipin Behari Basu, Muktear, Babu Dharanidhar Ghosh, Naib, Jatrapur kutchery, Babu Upendra Nath Kar, Sub-Overseer, Babu

Tarak Chandra Deb, Sarman, Babu Behari Lal Mohanta and some other gentlemen were present.

2. Babu Bipinbehary Basu proposed the respected Babu Susil Chandra Ghosh, Sub-Divisional Officer to be the President, and the respected Babu Harish Chandra Sarkar, Sub-Deputy Magistrate to be the Secretary and Babu Dharanidhar Ghosh seconded this proposal which was carried unanimously.

3. And then the respected Babu Harish Chandra Sarkar proposed Babu Dharanidhar Ghose to be the Assistant Secretary and the said proposal was carried unanimously.

4. Rupees 100 is to be spent for the urgent repairs of the Thakurbati whether the said sum is to be paid from the Rs. 200 promised by the Zemindar Babus of Gobardanga, or from the money with the Nazir will be settled after a reply is received after Babu Dharanidhar Ghosh, Naib of Jatrapur kutcheri, has written to the Zemindar Babus about the matter.

5. The Mohunt will within 10 days submit to respected Sub-Deputy Babu the accounts for the last two years.

6. Babu Dharanidhar Ghosh, the Naib of the Jatrapur kutcheri will write to the Zemindar Babus of Gobardanga about the repairs of the remaining portion of Gopal's *bati*.

7. Babu Dharanidhar Ghosh, Naib, will, within one month, furnish Babu Rabindra Nath Dhar, 1st Munsiff, with the deeds of Gopalbati, papers, chittas, Brahmotter (Taidad) etc. that may be in existence, and the boundaries of land and a statement of income and expenditure etc.

8. The school may at present be started; but the salary of the teacher will be settled later on.

(Sd) S. C. Ghosh, President,
Sub-Divisional Officer, Bagerhat."

From High Court Paper Pages 59—63.

"The second sitting of the General Committee for making arrangements for the repair of the temples etc., and for the carrying on of the *seba* etc. of Sree Sree Gopal Bari,

Sree Sreepat—Laupala Gopal Natmandir.
Dated, the 12th Kartic, 1328, 29th October, 1921.

Gentlemen present :

1. Doctor Preonath Nandy, Secretary, Sree Sree Krishna Chaitanya Tattwa Pracharini Sabha, Calcutta, 2. Babu Brojendra Lal Sen, Muktear, Bagerhat, 3. Babu Tarak Chandra Gupta, B.A., Headmaster, Bagerhat High School, 4. Babu Surendra Nath Basu, M A., Professor; Daulatpur College, 5. Babu Motilal Bhowmik, B.A., Bagerhat, 6. Babu Upendra Nath Kar, Sub-Overseer, Bagerhat and Secretary, Gopal Mandir Committee, Laupala, (and forty eight other gentlemen of several villages).

1. On the proposal of Babu Tarak Nath Gupta, B.A., Headmaster, Bagerhat High School, seconded by Babu Bepin Behari Bhattacharyya Kabyatirtha, Dr. Preonath Nandy is unanimously voted to the chair.

2. Then Babu Upendra Nath Kar, Sub-Overseer, Bagerhat, and Secretary, Gopal Mandir Committee in lucid language explains the object of the meeting, and makes a proposal of establishing an *asram* in the Bari of Sree Sree Gopal Jiew. In this *Aeram* Aryan 'philosophy, specially Vaishnab philosophy will be taght to the students— the Varnasram dharma being kept in tact and Brahmacharyya being followed by the students as far as practicable and along with that arrangement will be made for the teaching of agriculture, industries etc. Babu Surendra Nath Basu, M.A., Professor of Doulatpur College, seconds this proposal in a neat and instructive speech of not great length, wherein he explains the need and utility of the establishment of an *asram* and of the Seba of the idol. The proposal is carried unanimously.

3. Babu Brojendranath Sen, Muktear of Bagerhat Subdivision proposes that from now the Gopal Mandir Committee do take the entire charge of the protection and management etc. of the moveable and immoveable properties of Sree Sree Gopal Jieu, management of some of which properties had

in the past been entrusted by the Committee to particular individual from time to time for various reasons.

This proposal is seconded by Babu Surendranath Basu, M.A.,Professor of Daulatpur College, and carried unanimously.

4. Babu Brojendranath Sen, Muktear proposes that the six members who constitute at present the Gopal Mandir Committee will, at their option and if required, be competent, with the consent of half the members, to increase or reduce the number of members for facility of work.

This proposal is seconded by Babu Taraknath Gupta, B.A., Headmaster, Bagerhat School and carried unanimously.

5. The said Headmaster proposes that if needed for convenience of work the committee, with the consent of half the members, will be competent to make alteration and addition in the rules. The proposal is seconded by Babu Bipin Behary Bhattacharyya, Kabyatirtha, Pandit of Rangdia School and carried unanimously.

Then Babu Taraknath Gupta, Headmaster, Babu Bipin Behary Bhattacharyya, Kabyatirtha, Pandit of Rangdia School and Babu Sakhanath Dam made known to the public the present condition of Gopal Bari and the miraculous powers of Sree Sree Gopal Jieu, and appealed for contribution for "Gopal".

Then the Chairman in a timely and feeling speech adduced many proofs of supernatural powers of Gopal Jieu and explaining the utility of establishing an *asram* for the protection of *dharma* (religion) and achara (custom) he promised, as far as was within his power, to render aid to the repair of the temple of Sree Sree Gopal Jieu; and gave out the hope of collecting money, as far as was practicable for the said purpose from the reverent and devout persons of Calcutta. Then the Chairman took his seat after offering thanks to the former Deputy Magistrates of Bagerhat, devoted to religion, who had tried to the best of their might for the Seba of Gopal.

Then the meeting dissolved with a vote of thanks to the chair.

Sd. Preonath Nandy, Chairman